বিশেষ সংখ্যা
১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ স্মরণে

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং- ১৪।। ৩য় বর্ষ।। বুধবার।। ১০ই নভেম্বর ১৯৯৩ ইং।।

তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার জন্যে
দিয়েছি আমাদের আজকের দিনগুলো।

শহীদ প্রশান্ত কুমার চাকমা (জুলো)

শহীদ পরিমল বিকাশ চাকমা (রিপন)

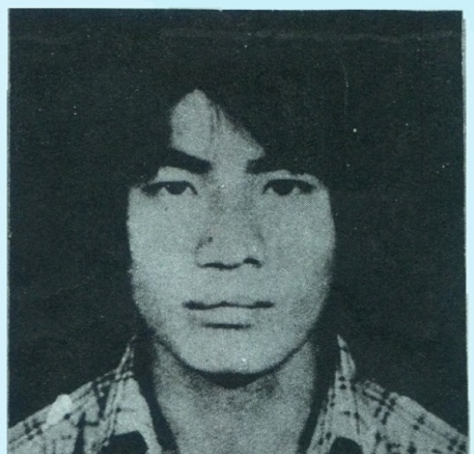

শহীদ মনিময় দেওয়ান (স্বাগত)

সূচীপত্র

১।	সম্পাদকীয়	১
২।	রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর — শ্রী পেলে	২
৩।	মৃত্যুঞ্জয়ী — শ্রী এস, বোস জার্নাল	১০
৪।	জুম্ম শরণার্থী সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গে— শ্রী উমং	১১
৫।	জুম্ম জাতীয়তাবাদ — শ্রী জগদীশ	১৭
৬।	নূতন প্রজন্মের চেতনা — শ্রী পেলে	২৩
৭।	শহীদের স্মরণে — শ্রী কিশোর	২৭
৮।	Religious Persecution and Islamization of the Chittagong Hill Tracts—Email	২৮
৯।	সংবাদ	
	জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের একাদশতম বৈঠক	৩৬
	সাবেক জেলা প্রশাসকের স্ত্রীর নামে জুম্ম জমি বন্দোবস্তি	৩৭
	সরকারী উদ্যোগে বে-আইনী অনুপ্রবেশ	৩৭
	বান্দরবানে চাকুরী ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা থেকে উপজাতীয়রা বঞ্চিত	৩৭
	জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর	৩৮
	জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃতি	৩৯
	বান্দরবানে ১২টি বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা	৪০
	সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ ও হয়রাণী	৪০
	ছাত্র মিছিলে পুলিশের হামলা	৪১

সম্পাদকীয়

১০ই নভেম্বর, জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত, মুক্তির পথপ্রদর্শক ও জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মৃত্যু বার্ষিকী ও জুম্ম জাতির শোক দিবস। ১৯৮৩ এর এদিনে চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকার চরম হিংস্রতার উম্মত্ততায় প্রাণ দিতে হয়েছে মহাননেতাসহ আটজন মরণজয়ী বীর জুম্মকে। এবারে ১৯৯৩ এর শেষ লগ্নে শীতের পরশ নিয়ে এই বিষাদময় দিনটি আবার সেই মৃত্যুহিম শীতলতা নিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে। তাই জুম্ম জাতি আজ পালন করতে যাচ্ছে মহাননেতার দশম মৃত্যু বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস।

জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ও অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধে শাহদাৎ বরণ করতে হয়েছে অসংখ্য বীর যোদ্ধাকে। প্রতিবারের মত এবারেও সকল মুক্তিকামী জুম্ম জনগণ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছে সেই মহান শহীদ-মহাননেতা মানবেন্দ্র লারমাসহ শুভেন্দু, অপর্ণা, জুনি, মিশুক, রিপন, স্বাগত, অর্জুন, সৌমিত্র এবং বীর যোদ্ধা দীপেন, জীবন, সৈকত, সবুজ, প্রভাত, ঝণ্টু, রাম, সুকান্ত, রোমেল, পশ্চি, বিনয়, ইমান, সুদর্শন, দীনেশ, আরো অনেক আত্মদানকারীকে. আর সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছে সকল শহীদের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনসহ পঙ্গু ও শত্রুর কারাগারে বন্দী বীর যোদ্ধাদের।

১০ই নভেম্বর, জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত ও ঘৃণিত এক কালো দিবস। এদিন ষড়যন্ত্রকারী চার কুচক্রী—গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশরা নিজেদের দুর্নীতি, ব্যাভিচার ও অনাচার ঢাকতে ও পার্টি সর্বময় ক্ষমতা দখলের জন্য জুম্ম ইতিহাসের সবচেয়ে হিংস্রাশ্রয়ী ও নিষ্ঠুরতম হত্যালীলা সংঘটিত করে। অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধের উম্মত্ততায় রচিত হয় চরম হতাশার মাঝে দৃপ্ত সংহতি ও নির্ধারিত হয় বিশ্বাসঘাতকদের নির্মম পরিণতি। দেশ ও জাতির চরম বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানি নিয়ে চার কুচক্রীরা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু চার কুচক্রীর দোসর প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী গোষ্ঠী আজও জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বানচাল করতে দেশে-বিদেশে তৎপর। তাই এদিনে শহীদদের মহান আত্মত্যাগের প্রেরণা নিয়ে চক্রান্তকারীদের সকল ষড়যন্ত্রকে মূলোচ্ছেদ ও প্রতিরোধ করতে জুম্ম জাতি দৃঢ় শপথ নিচ্ছে।

সুদীর্ঘ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের বাস্তবতায় শত শত নিরীহ জুম্ম নরনারী আবালবৃদ্ধ-বনিতা অকালে প্রাণ হারিয়েছে। ধর্ষণ, অপহরণ, লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগে জুম্ম ভূমি আজ কলুষিত। অর্থনৈতিক বঞ্চনা, শোষণ ও অবরোধে জুম্ম অর্থনীতি বিপর্যস্ত। ঐসলামিক আক্রমণে জুম্ম ধর্ম, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক জীবন অবরুদ্ধ। এখনো লক্ষাধিক জুম্ম নরনারী বিদেশের মাটিতে প্রবাসী ও হাজারো পরিবার স্বদেশে পরবাসী। জুম্ম জনগণের এহেন অবস্থার অবসান হতে পারে একমাত্র ৫ দফা অধিকার অর্জনের মাধ্যমে। তাই এই ৫ দফা অর্জনের লক্ষ্যে আরো ঐক্যবদ্ধ, সংহত ও সচেতন হয়ে মহান আত্মত্যাগ ও সংগ্রাম করার শপথ নিতে হবে '৯৩ এর এদিনে।

যুগে যুগে অন্যায়ের পতন আর ন্যায় ও সত্যের জয় হয়েছে। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের আন্দোলন। তাই এই আন্দোলনের সমর্থনে আজ বিশ্ব মানবতা এগিয়ে এসেছে। দেশে বিদেশে এই আন্দোলন আজ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। বিগত ১ বছর ধরে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যকার যুদ্ধবিরতি ও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। তাই মহান শহীদদের আত্মোৎসর্গ হোক জুম্ম জাতির প্রেরণার উৎস ও ভবিষ্যতের পাথেয়।

গৃহযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধোত্তর ঘটনা প্রবাহ এটাই প্রমাণ করেছে যে প্রয়াত নেতার প্রদর্শিত নীতি ও আদর্শই হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন এগিয়ে নেয়া ও জয়যুক্ত করার একমাত্র চাবিকাঠি। আর তাই এই নীতি আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আজ পার্টি ও সমগ্র কর্মী বাহিনী নূতন করে আবারো দৃঢ় শপথ নিচ্ছে

রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর

—শ্রী পেলে

সেই এক হৃদয় বিদারক, বিভীষিকাময় ঘটনা, উদ্বেলিত হৃদয়ের রক্তকণিকা খসে পড়া একটি মুহূর্ত…।…অসংখ্য তারকাখচিত উদার আকাশ থেকে হঠাৎ যদি কোন উল্কাপিণ্ড খসে পড়ে মানুষের চমক লাগার মত কিছুই নয়; কিন্তু উজ্জ্বল শশীকলার আলোর বন্যায় যদি রাহুগ্রাসে হঠাৎ বিষাদের কালো ছায়া নামে তাহলে সারা দুনিয়ার মানুষ ব্যথিত ব্যাকুল ও হতচকিত না হয়ে পারে না। বিশ্বের বিভিন্ন জাতির ইতিহাসে যেমনি রয়েছে সেই অতি শোকাবহ ও বিষাদের কালো দিন, তেমনি রয়েছে আমাদেরও। জাতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আমরা ও জুম্ম জনগণ করে যাচ্ছি প্রতিবাদ, পাশবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আর ষড়যন্ত্র ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গড়ে তুলছি প্রতিরোধ। তাই স্বভাবতই যাবতীয় অত্যাচারী শক্তি ও ষড়যন্ত্রকারী গুণ্ডামীই হয়েছে আমাদের শত্রু। সেই ভণ্ড শত্রুদেরই বিষাক্ত নখের আঁচর—জাতীয় ইতিহাসের নবচাইতে জঘন্যতম, ঘৃণ্যতম, ১০ই নভেম্বর—যা গোটা বিশ্বকে করেছে হতবাক্ আর জুম্ম জাতি হয়েছে সান্ত্বনাহীন ব্যথায় ব্যথিত ও শোকাভিভূত।

জুম্মজাতির ইতিহাসে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশচক্র একটি কলঙ্ক ও একটি জঘন্যতম ষড়যন্ত্র। অতি শোকাবহ ও মর্মান্তিক ১০ই নভেম্বর-এর কালো দিবসের স্মৃতি রোমন্থনের পূর্বাহ্নে জুম্মজাতির কুলাঙ্গার গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশচক্রের হীন চরিত্র ও উদ্দেশ্য উন্মোচন করা অপরিহার্য। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশচক্র যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ পার্টির পতাকাতলে সমবেত হয়ে কাজ করেছে তথাপি পার্টি নেতৃত্বকে কখনই মেনে নিতে পারেনি। দুর্নীতিবাজ, ক্ষমতা লিপ্সা, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা, ব্যাভিচার, উচ্চাভিলাস—এদের স্বভাব চরিত্রে মজ্জাগত ছিল। অথচ এই কুচক্রীরা শ্রদ্ধেয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে পশ্চাতে ও সঙ্গোপনে অনেক বিরূপ মন্তব্য ও অপপ্রচার—যেমন কখনও বলতো ধর্মভীরু, কখনও বা আপোষ পন্থী, কখনও বলতো একরোখা সর্বোপরি তার একনিষ্ঠ ও যোগ্যতর সহকর্মীদের বিশেষতঃ সন্তু লারমার বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার ও কুৎসা রটনা করতে বরাবরই প্রয়াসী ছিল এবং সমগ্র পার্টিতে একটা প্রভাব বিস্তারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু সামনাসামনি কোন মন্তব্য করার সৎসাহস কারোর ছিল না। পক্ষান্তরে তারাই উপযুক্ত, তারাই সবজান্তা, তারাই জুম্মজাতির জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে দাবী করতো নির্লজ্জভাবে। তাই এই নেতৃত্বকে তারা বিষাক্ত আগাছা বলেই মনে করতো। একারণে তারা এই নেতৃত্বের প্রতি তাদেরই মধ্যে গালমন্দ করতো, ঘৃণাভরে ভর্ৎসনা করতো এবং মুখ বিকৃত করে অভিশাপ দিত আর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে সচেষ্ট থাকতো। কিন্তু শ্রদ্ধেয় নেতার পিতৃহৃদয় ও বিপ্লবী সত্বা বরাবরই বিশ্বাস করতো—তাদের একদিন না একদিন সুমতি হবে এবং আত্মসমীক্ষা করে একদিন সৎপথে ফিরে আসবে। কিন্তু নেতার এই সহনশীলতা ও ক্ষমাশীল মনোভাবকে তারা দুর্বলতা বলে বিবেচনা করতো এবং পরিশেষে একদিন ক্ষমতা কেড়ে নেবার উন্মত্ততার ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিল। ১৯৮২ সালের জাতীয় সম্মেলনে তারা সশস্ত্র বাহিনীকে উস্কানি দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের এক বিরাট অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু সচেতন কর্মী বাহিনীর সামনে সে সব ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল হয়ে যায়। তা সত্বেও পার্টি নেতৃত্ব তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক পুনর্বার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু অবিশ্বাসের ভূত তাদের কায়-মন-বাক্য থেকে কখনও সরে পড়ল না। পুনরপি তারা ষড়যন্ত্রের পথে পা বাড়াতে থাকে। তারা পার্টির অভ্যন্তরে থেকে পার্টির বিরুদ্ধেই স্যাবোটেজ আরম্ভ করে দেয় এবং তাতে মারা ও পানিতে যাবার বিষবাষ্প সৃষ্টি করে। তার ফলে সমগ্র পার্টি ব্যাপী এক চরম সংকট ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তারপর এক সময় অকস্মাৎ ঘটলো বিস্ফোরণ। সেই বিস্ফোরণে পেটের নাড়িভুড়ি সব বেরিয়ে পড়ল এবং কুরুক্ষেত্রে কলিজা ফাটা আর্তনাদ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। পরিণতিতে চক্রান্তকারীদের সার্বিক অবস্থা দ্রুত ডুবন্ত সূর্য্যের মতই যখন মুমূর্ষু হয়ে দেখা দিল তখন হন্যে হয়ে সমঝোতার পথ খুঁজতে থাকে। অতঃপর পার্টি নেতৃত্ব জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে "ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া" নীতির ভিত্তিতে গণতন্ত্রের পথ সুগম করার মানসে এক সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু পৃথিবীতে যত ধর্মের কাহিনীই থাকুক না কেন চোরারা তা শুনতে কখনই রাজী নয়। তারা আরো নতুন কায়দায় ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে গোপনে গোপনে। সংক্ষেপে এই হলো ১০ই নভেম্বরের পূর্বকালীন অবস্থা।

এইভাবে চলতে থাকে একদিকে ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে প্রতিরোধ। এমনিভাবে বর্ষা চলে গেল। শরতের আগমন ঘটল। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু করতে করতে একদিন শারদীয় নির্মল দিনগুলোও নিরসমুখে বিদায় নিল। চক্রান্তকারীদের ষড়যন্ত্র তবুও যেন শেষ হলো না। চক্রের হোতা গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আসার কথা ছিল কিন্তু তারা এলো না। এক সময় প্রকাশ জানালো যে তার অনুগামীদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না। তাই কেন্দ্রের সাহায্য চেয়ে এক জরুরী চিঠি পাঠালো। অনেকের সন্দেহ হলো যে সমঝোতায় হয়তো চক্রান্তকারীরা আসতে নারাজ। এ ব্যাপারে নেতার কাছে পরামর্শ চাওয়া হলে শ্রদ্ধেয় নেতা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমেই সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে উঠলো। তাই তখনকার অস্থায়ী ব্যারাকটা অন্যত্র সরে নেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। কারণ চক্রের হোতা গিরি ঐ অস্থায়ী ব্যারাক থেকেই চলে গিয়েছিল।

নভেম্বর পয়লা সপ্তাহ। পূর্বের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য রিপ ও সেক্টর কম্যাণ্ডার মেজর দেবংশীর নেতৃত্বে বিশ্বাস-ঘাতক প্রকাশের চিঠিমূলে চক্রান্তকারীদের সাহায্য করতে ও উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে একটা দল বাইরে চলে গেল এবং অস্থায়ী ব্যারাক স্থানান্তরিত করার কাজে আরো একটা দল বাইরে চলে গেল। হঠাৎ দুই নম্বর সেক্টর থেকে জরুরী ডাকে খবর এলো যে চক্রান্তকারীদের জনৈক কম্যাণ্ডার তাদের কাছে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে এবং সঙ্গে এই কথাও বলেছে যে চক্রান্তকারীরা আবারো চক্রান্ত করার পাঁয়তারা করছে। সপ্তাহের শেষ দিন। শোনা গেল বাংলাদেশ বেতার থেকে খবর পরিবেশিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। প্রথমে হুঁশিয়ারী সংকেত, পরে বিপদ সংকেত। এভাবে সংকেত নম্বর ৩, ৪, ৫ হতে এক সময় মহাবিপদ সংকেত দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঘের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আমরা ভাবলাম দুর্যোগ বুঝি এখনও কেটে যায়নি। প্রকৃতির এ ভয়ঙ্করতা ও রুদ্ররূপ হৈমন্তির দিন-গুলোকেও বুঝিবা রেহাই দিচ্ছে না। আমাদের সতর্কতা আরও বাড়ানো হলো। বিশেষ প্রোগ্রামে শ্রদ্ধেয় লীডার একটু বাইরে গেলেন; কড়া প্রহরার মধ্যে তিনি ফিরে এলেন রাত্রে। সেদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজে এবং শীতল হাওয়ার শিকার হয়ে লীডার অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। আবহাওয়া আরো খারাপ হয়েছে। প্রায়ই ঝড়ো হাওয়া এসে গোটা পরিবেশটাকে বিষণ্ণ করে তুলেছে। ডাঃ জুনির নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্যা সত্ত্বেও লীডার নিরাময় হয়ে উঠতে পারলেন না। রাত প্রায় তিনটে, লীডার অসুখে ছটফট করছেন, নিরন্ন মুখে বিনীদ্র রজনী কাটিয়েছেন। আমরা যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এদিকে সন্তু স্যারও প্রেসিডেন্ট এরশাদের ৩১ অক্টোবরের ঘোষণার বিপরীতে খোলা চিঠি লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আর অস্থায়ী ব্যারাকটা স্থানান্তরিত করা সম্ভব হলো না। নভেম্বরের ৯ তারিখ বৃষ্টির প্রকোপ কিছুটা কমেছে বটে কিন্তু প্রায় সময়টা জুড়ে বায়ু-প্রবাহ বয়ে চলেছে। সারাক্ষণ কাকের কা-কা রবে প্রকৃতি যেন কিসের এক আশংকায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। বিকেলে লীডারকে কিছু বিস্কুট খাওয়াবার চেষ্টা করা হলো কিন্তু তিনি খেতে পারলেন না। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সবাই যার যার বিছানায় শুয়ে পড়েছে। রাত ৮টা নাগাদ পাশের ঝিরিতে কি যেন একটা গড়িয়ে পড়ার শব্দ শোনা গেল। দু'জন সৈনিক টর্চলাইটের আলো দিয়ে জায়গাটা চার্জ করে এলো। কিছুই দেখতে না পেয়ে প্রকৃতির ঘটনা ভেবে তারাও ঘুমিয়ে পড়লো। রাত ১১-১৫টা পর্যন্ত আমরা ৪ জন প্রহরায় ছিলাম। তখনও প্রায় ভারী কিন্তু শুষ্ক হাওয়া বয়ে চলেছিল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে জোছনার আলো যেন পৃথিবীর সঙ্গে লুকোচুরি খেল-ছিল। তখন কেউই বা জানতো প্রকৃতির মধ্যে কোন বিভীষিকা-ময় ঘটনা ঘটার জন্য প্রতীক্ষা করছে কিনা। প্রহরী বদল করে আমরা শুয়ে পড়লাম। আমার পাশের সঙ্গীটার সামান্য জ্বর ছিল। অতএব তাকে কোন রকম বিরক্ত না করে একটু অসুবিধার মধ্যে হলেও ঘুমিয়ে পড়লাম।

১০ই নভেম্বরের ভোর রাত সাড়ে তিনটে বাজতে তখনও কিছু বাকী। গভীর তন্দ্রা থেকে বিদ্ঘুটে এক স্বপ্নের শিহরণে আমি হঠাৎ জেগে গেলাম। শয্যার উপর বসে চারিদিকে একটুখানি তাকালাম—দেখলাম প্রহরী বদল হচ্ছে। হাতের ঘড়িটা টর্চের আলোতে একটুখানি দেখে নিয়ে আবার গা এলিয়ে দিলাম। ভাবলাম বোধ করি একটু অসুবিধার মধ্যে ঘুমের তন্দ্রা পাচ্ছে। পায়ের কাছে একটু কড়মড় শব্দ হওয়াতে ঘুমুতে গিয়ে এভাবে দুঃস্বপ্নের মধ্যে ঘুম ভাঙলো। তারপর আস্তে আস্তে টের পেলাম পিনহোল টর্চের আলো দিয়ে কে যেন বাইরে যাচ্ছে—আর একটু পরেই অকস্মাৎ কারবাইনের ব্রাশ ফায়ার হলো ট-ট-ট-টশ্। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পায়ের দিকের মাটিতে লাইং পজিশন নিলাম। "মুই রিপন, রিপন", কথাটা শুনতেই তাকিয়ে দেখি রিপনদা "ওমা", "ওমা" করতে করতে উঠোনে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। কিছু একটা বোধগম্য না হতেই চিৎকার দিয়ে বললাম কি হয়েছে, কি হয়েছে! তখন উত্তর-পশ্চিম কোণ-এর পায়খানা ঘরের রাস্তার মুখে (বড় ব্যারাকের একদম] [illegible]

আমাদের L M G ম্যানের খুব কাছাকাছি) থেকে একজন সোজা দক্ষিণ দিকে লীডারকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত ব্রাশ ফায়ার করছে, অন্যজন আমাকে ও সন্তু স্যারকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে চলেছে। আর বিশ্বাসঘাতকেরা ইয়া আলী, ইয়া আলী ... শব্দ করছে এবং আগুনো এডভান্স, এডভান্স করে বিকৃত গলার স্বরে শব্দগুলো উচ্চারণ করছে। ততক্ষণে আরও ৪/৫ জন আমাদের ব্যারাকের খুব কাছে (আমার থেকে ৫/৬ গজ দূরত্বে) এসে একসাথে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে দিয়েছে। বোঝা গেল চক্রান্তকারীরা বাংলাদেশ আর্মি প্লান করে বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণ করতে এসেছে। ট্রেঞ্চে গিয়ে পজিশন নিলাম। সেখানে সন্তু স্যার ও মিহিরদাকে নাগাল পেলাম। ততক্ষণে সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট মনিময় ও কর্পোরেল অর্জুন উত্তর পার্শ্বের ট্রেঞ্চগুলোতে পজিশন নিতে গিয়ে সরাসরি শত্রুদের ফায়ারের মুখে পড়ে ইহলীলা সংবরণ করল। ঐ দুটো অস্থায়ী ব্যারাকে আমরা ২০/২২ জন মানুষ ছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে সবচাইতে অসুবিধার দিকটি ছিল এই যে শত্রুরা রয়েছে উত্তর প্রান্তে আর আমরা পজিশন নিতে বাধ্য হয়েছি দক্ষিণ প্রান্তে মাঝখানে রয়ে গেছে দুটো ব্যারাক ও বাদবাকী মানুষগুলো। তাই বাদবাকী মানুষগুলোর কথা ভেবে আমরা ঠিকমত ফায়ারই করতে পারছিলাম না। কারণ সেই অন্ধকারে কাকেও সঠিক ভাবে চেনা যাচ্ছিল না।

আমরা অস্থায়ীভাবে তিন ভাগে ভাগ হয়ে অবস্থান করছিলাম। পাহাড়ের সর্বোচ্চ উত্তর দক্ষিণ লম্বালম্বি ব্যারাক, সেখান থেকে ৪০/৪৫ গজ নিচে পাহাড়ের মাঝামাঝিতে সামনাসামনি দুটো ব্যারাক ব্যারাকের পাশে দক্ষিণমুখী হয়ে একজন সেন্ট্রী থাকে। সেখান থেকে ২০/২৫ গজ নিচে ঝর্ণার কাছাকাছিতে পাকঘর কাম ব্যারাক দুটো পাশাপাশি, সেদিকে পূর্বমুখী একজন সেন্ট্রী ও উপরের ব্যারকের উত্তর দক্ষিণ হয়ে দুটো সেন্ট্রী মিলে সর্বমোট ৪ জন সেন্ট্রী সব সময় থাকতো। কিন্তু শত্রুর মুহুর্মুহু ফায়ার ও হাত বোমার আওয়াজ করতে করতে মধ্য ব্যারাকের উঠোন বরাবর ও ব্যারাকের নিচে ঢুকে পড়েছিল। উপর্যুপরি ব্রাশ ফায়ার ও হাত বোমার বিস্ফোরণে মনে হচ্ছিল প্রতিহিংসার উন্মত্ততায় শত্রুরা যেন প্রতিটি ঝোপঝাড়কেও ধ্বংস করে দিতে চাইছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ট্রেঞ্চের কাছাকাছিতে দুটো হাত বোমা ফেটে যায় এবং প্রবল বেগে গোলা বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু কম্যাণ্ডার সন্তু স্যার উপরের ফাইটিং গ্রুপ নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করতে সংকেত দিতে সচেষ্ট থাকেন। ইতিমধ্যে কর্পোরেল জাপানকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পার্টির বিভিন্ন ইউনিটের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানেরও সন্তু স্যার ব্যাপৃত থাকেন। এমন সময় উপর থেকে আমাদের ফাইটিং গ্রুপ এসে শত্রুদেরকে পাল্টা আক্রমণ করতে শুরু করে। চতুর্দিক থেকে ফায়ারের আওয়াজ শুনে শত্রুরা মন্ত্রী-মন্ত্রী বলে ডাকাডাকি শুরু করে দেয় এবং কয়েকবার লম্বা লম্বা বাঁশি বাজানোর পর পূর্বদিকের ছড়া (ঝর্ণা) বেয়ে চলে যায়। কিন্তু ততক্ষণে লীডার সহ ৮ জন ঘটনাস্থলে শহীদ হন এবং কর্পোরেল সৌমিত্র ও কর্পোরেল বকুল আহত হয়। কিন্তু সৌমিত্র ঘোরতর ভাবে আহত হয়ে লীডারের জায়গা থেকে সামান্য দূরের ঝোপে আড়াল করা একটা গর্তে নিজেকে কোন মতে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি আহত অবস্থায় দুইদিন বেঁচে থাকেন। তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণ থেকে জানা যায়—লীডার প্রথমে পায়ে গুলিবদ্ধ হয়ে আহত হন কিন্তু অসুস্থ শরীর ও দুর্বলতা হেতু সরে যেতে পারেননি। শত্রুরা ব্যারাকের ভিতরে ঢুকে লীডারকে আহতাবস্থায় দেখতে পায়। তখন লীডার হত্যাকারীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পান। লীডার প্রথমে বলেন—"কি, তোমাদেরকে ক্ষমা করে আমরা কি অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করোনা কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনও ভুলে যেও না আর জাতির এ আন্দোলনকে কখনও বানচাল হতে দিও না"। লীডারের কথা শুনে উপস্থিত দু'জন শত্রু নীরবে চলে যায়, তারা আর ফিরে আসেনি। ততক্ষণে তাদের মধ্যে কড়া ভাষায় কথা কাটাকাটি হতে শোনা যায় এবং সন্ত্রস্ত কণ্ঠে "ও ষেদং ভিলে ষেদং" শব্দ শোনা যায়। সেই মুহূর্তে বিদ্যুৎগতিতে কে একজন এসে লীডারের গায়ের উপর উঠে কোন কথা না বলে ব্রাশ ফায়ার করে দ্রুত পালিয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পরেই ঐ জায়গাটি আমাদের পুনর্দখলে আসে এবং সমস্ত শত্রুদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কর্মীরা এসে শ্রদ্ধেয় লীডারের বুক জড়িয়ে ধরে এবং আবেগাকুল ও উদ্বেলিত কণ্ঠে বলতে থাকে "স্যার—ও স্যার আমরা তো তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না। তুমি ছাড়া আমরা কোথায় থাকবো স্যার"। শ্রদ্ধেয় লীডারের বুক তখনও উষ্ণ ছিল। তিনি কোন মতে চোখ মেলে তাকালেন এবং হাত দিয়ে কি যেন সান্ত্বনা দিতে চাইলেন কিন্তু কোন কথা বেরুল না, কোন অশ্রু ঝড়লোনা। শুধু বুকের তাজা রক্ত বিছানা গড়িয়ে টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়তে লাগলো। তারপর চোখ খোলা রেখে লম্বা এক বুকভরা শ্বাস নিয়ে অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় চিরশায়িত

হয়ে রইলেন…। নির্মম এই পৃথিবী যিনি নিপীড়িত, নির্যাতিত ও শোষিত জাতির সেবায় নিজের শেষ রক্ত বিন্দু টুকুও দান করে গেলেন সেই জাতি তাদের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূতকে এক ফোঁটা ঔষধ খাওয়াবার সুযোগ পেলনা।

তাঁর স্বাভাবিক উজ্জ্বল চেহারা, তাঁর খোলা চোখ যেন তিনি এখনও স্বাভাবিক। দেখে মনে হয় মৃত্যুর পূর্বক্ষণেও কোন প্রকার ভয়ভীতি তাঁকে যেমন ছোঁয়াতে পারেনি, তেমনি জন্মভূমির মায়া প্রকৃতির আলো বাতাস দু'চোখ ভরে দেখার সাধ এখনও মিটেনি। উত্তপ্ত রক্ত প্রবাহে বিদ্যুৎ খেলানো শান্তি বাহিনীর বীর যোদ্ধারা শত্রুকে তাড়া করে ফিরে এসেই জিজ্ঞেস করে স্যার কোথায়? যখন দেখে স্যারের নিষ্প্রাণ দেহখানি পড়ে রয়েছে তখন কেউ আর অশ্রু সংবরণ করতে পারে না। কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে 'শেষ……সব শেষ চক্রান্তকারী গুণ্ডারা আজ স্যারকে হত্যা করে আন্দোলনকে ধ্বংস করলে? তোমাদের একদিন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'' সেদিনের কান্না প্রিয় নেতাকে হারানোর ব্যথা, সেই চিরবাঞ্ছিত দৃষ্টি শক্তিকে হারানোর চাইতেও গভীর ও মর্মন্তুদ। যে মানুষটি জুম্ম জাতির মুক্তি কামনায় বছরের পর বছর কঠোর সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন, যে বিপ্লবী কণ্ঠ ছিল দুনিয়ার সমস্ত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার সেই অগ্রনায়ক, জাতির কর্ণধার, জাতীয় চেতনার আলোকবর্তিকা যেন তার সমস্ত সলিতা বিসর্জন দিয়ে নিজের দায়িত্ব সমাপন করলেন। কিন্তু জাতিকে তার আরো অনেক কিছুই দিবার মত ছিল।……সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে … হৃদয়ের গভীরতম আবেগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রয়েছে দেখে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম—অশ্রু মুছে নিলাম। সান্ত্বনা দেবার জন্য কিছু বলতে যেয়েই কণ্ঠরোধ হয়ে এলো যেন বিধাতা সেদিন সমস্ত বাক্‌শক্তিকে কেড়ে নিয়েছেন। সমস্ত দেহটা অবসন্ন বোধ করছি। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠলো। মিহিরদা সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— ''যা হবার তো হয়েই গেছে সেটা ফেরাবার আর নেই। তোমরা ধৈর্য্য ধরো। আর আহত সৌমিত্রকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।'' অবশেষে সমস্ত শক্তি দিয়ে আত্মসংবরণ করলাম। লীডারের গোছানো জিনিষগুলো এক জায়গায় জড়ো করে প্রয়াত নেতার মরদেহের উপর কাপড় জড়িয়ে দিলাম। কিন্তু মুখ ঢেকে দেবার সাহস হলো না। যেই মুখ উগ্রধর্মান্ধ স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার ও উগ্র বাঙ্গালী মুসলমান জাতীয়তাবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দুর্গ গড়ে তুলেছিল, সেই অভূতপূর্ব মুখখানি ঢাকা দিতে সাহস হলোনা।

সেদিনের আকাশ ছিল মেঘলা, মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া এসে সমস্ত পরিবেশটাকে স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছিল। ব্যারাকের সমস্ত জিনিষপত্র বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো ছিটানো। উঠানে ও মেঝেতে হাত বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত কালো দাগগুলো সমস্ত পরিবেশটাকে কলুষিত করে রেখেছিল। বেপরোয়া গুলির আঘাতে সমস্ত কাপড়চোপড় ছিন্নভিন্ন হয়ে এলোপাথারি পড়ে রয়েছে; ইতস্ততঃভাবে গোলাগুলি পড়ে রয়েছে। ব্যারাকের ভিতরে লাশ, উঠানে লাশ, রাস্তার উপরে লাশ সবাই যেন বিছানাহীন শয্যায় অনাদরে লুটোপুটি দিচ্ছে। আমরা সব মরদেহগুলো এক জায়গায় জড়ো করে কাফন মুড়িয়ে দিচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম চক্রান্তকারী শত্রুরা ঐ মরদেহগুলোর উপর অহেতুক গুলি বর্ষণ করে তাদের প্রতিহিংসার ঝাল মিটিয়েছে। পাষণ্ডতার এই কুলক্ষণ উন্মত্ত পাগলা কুকুরকেও অনায়াসে হার মানিয়ে দেবে। তখনও বাতাসে সর্বত্রই পোড়া বারুদের উগ্র গন্ধ। প্রকৃতির বিমর্ষ ভাব যেন নাছোড়বান্দা। মৃদু সঞ্চরমান মেঘের ফাঁকে ফাঁকে কখনও এক ঝলক রোদ এসে ধরণীর অশ্রু মুছিয়ে দেবে এটুকু ক্ষীণ আশাও সেদিন ছিলনা। মাননীয় ফিল্ড কম্যাণ্ডার সন্তু লারমা মিহিরদাকে আহতদের চিকিৎসার ভার দিলেন। আশেপাশের সমস্ত এলাকা চার্জ করে দেখার নির্দেশ দিলেন আমাদেরকে। তার পরদিন অন্যান্য সব ইউনিটগুলোতে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত খবর পাঠাবার ব্যবস্থা নিলেন এবং ঔষধ সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করলেন। ইতিমধ্যে দুঃসংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। আশেপাশে বন্ধুবান্ধবরা দলে দলে এসে ভীড় জমাতে শুরু করছে। সবাই প্রয়াত নেতাকে শেষবারের মত দেখতে চায়। অবশেষে সন্তু স্যার এসে পৌঁছলে উপস্থিত লোকজনদের প্রিয় নেতার শেষ দর্শনের অনুমতি দিলেন। ব্যারাকের ভিতরে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে! একজন বৃদ্ধ লোক এসে প্রয়াত নেতার কাফন খুলে দেখলেন। তাঁর গুলিবিদ্ধ ঝাঁঝড়া বুক দেখে আস্তে ধীরে বসে পড়লেন এবং কপালে হাত রেখে অশ্রুসিক্ত বিস্ফারিত নয়নে বিলাপ করতে শুরু করলেন—''হে দেশমাতৃকার প্রকৃত বীর সন্তান! আমরা জানি শত প্রলোভন তোমাকে মোহিত করতে পারেনি; একটা আগ্রাসী জাতির যাবতীয় হুমকি তোমাকে বিচলিত করতে পারেনি; তোমার মানসিক দৃঢ়তায় কোনদিন ভাটা পড়তে দেখিনি। তোমার স্বার্থত্যাগ আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তোমার প্রেরণায় গোটা জাতি আজ বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে সাহসী হয়েছে তবুও তোমার শত্রুরা জাতির কুলাঙ্গারেরা তোমাকে এভাবে হত্যা করলো।'' তিনি ধুকরে কেঁদে উঠলেন।

সবাই অশ্রুসজল নেত্রে এক বাক্যে বলে উঠলো—সত্যিই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই হয়েছে। সবাই বলে উঠলো—হে ভগবান, তুমি এই খুনীদের, এই বেইমানদের বিচার করো। জনতার সারি থেকে আরো একজন বৃদ্ধ এসে অশ্রু মুছে নিয়ে প্রয়াত নেতার কপালে হাত রেখে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ বলে আশীর্বাদ দিতে দিতে বললেন— "তুমি তো যেখানেই যাওনা কেন সবসময় 'সর্বে সত্তা সুখিতো ভবন্তু' (সকল প্রাণী সুখী হোক) বলে ধর্মীয় বাণী প্রচার করতে, কতবার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কাজ করতে দেখেছি, কাকেও তুমি হিংসা করতে না, কিন্তু তবুও আজ তোমার শত্রুরা হিংসা করে হত্যা করলো বলে তুমি দুঃখ করোনা। তুমি স্বর্গবাসী হবে; পরিনির্বাণ লাভ করবে। কোন প্রাণীকে তুমি হত্যা করতে না। তোমার এই সৎকর্মের ফল ইহকালে না হলেও পরকালে ভোগ করবে।" উপস্থিত জনতা সবাই সমস্বরে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো—"শান্তি বাহিনী-ভায়েরা, মূর্খ শিষ্যের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও ভাল। গৌতম বুদ্ধের এই উপদেশটা কখনও ভুলে যেয়ো না। যারা মূর্খ, যারা বেইমান। তাদেরকে ক্ষমা করার কোন দরকার নেই।

ততক্ষণে আশেপাশে কর্মরত বাহিনীর সকল সদস্যগণ এসে জড়ো হয়েছেন। সবাই পুরো ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্য নানা প্রশ্ন করছেন। পরে উপস্থিত জনতা সরে গেলে প্রিয় নেতার বিদেহী আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য নীরবে অশ্রু সিক্ত নয়নে ব্যারাকে উঠে এসেছেন। এভাবে কর্মীরা যখন আসতো প্রিয় নেতা তাড়াতাড়ি এসে অভ্যর্থনা জানাতেন। সবারের সাথে করমর্দন করতেন এবং আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করতেন। তারপরে তাঁর পাশে বসিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়ে পড়তেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কুশল বার্তা ও পরিস্থিতির খবরা-খবরগুলো অতি নিখুঁত ভাবে জেনে নিতেন। তার এ বিনয়ী মনোভাব, মহানুভবতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। পার্থিব জগতের দুঃখ বেদনা অভাব অভিযোগ সব কিছুই ভুলে যেত তার এই অমায়িক ব্যবহারে। তার সাথে আলাপ করে প্রত্যেকটি কর্মী নতুন প্রেরণা লাভ করে উজ্জীবিত হয়ে ফিরে যেত। কিন্তু এই দিনে কত কর্মী এসে জড়ো হয়েছে সে প্রেরণা আর কেউ পেল না। কারো সাথে করমর্দন হলো না, কাকেও আলিঙ্গন করলেন না। তিনি রয়েছেন তারই প্রিয় বিছানায় নির্বিকার চিত্তে; চির শায়িত হয়ে......কোন রকম উত্তেজনা, কোন রকম শোকার্ত কান্না তাঁকে আর বিচলিত করবে না। ......সবাই ধীরে ধীরে তাঁর শবদেহের পাশে হাতিয়ার রেখে দুই হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে সম্মান জানাচ্ছেন, কেউ কেউ দুপায়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করেছে—স্যার, তুমি আর আদর করবে না স্যার? তুমি কি আলাপ করার জন্য কাছে ডাকবে না স্যার? হায়রে অবুঝ হৃদয়! এত কিছু দেখেও কি বিশ্বাস করতে পারছো না? ... ..তবুও তো বাস্তবতাকে মানতে হয়। তারপর কয়েকজনে মিলে আমরা তার জিনিষপত্রগুলো তদন্ত করে দেখলাম। অনুসন্ধান করে দেখা গেল চক্রান্তকারী শয়তানেরা প্রিয় লীডার ও সন্তু স্যারের সঙ্গের যাবতীয় দলিল-পত্র সহ অন্যান্য জিনিষপত্রাদি প্রায়ই লুঠ করে নিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকখানা হাতিয়ার গোলাবারুদ সহ অন্যান্য জিনিসপত্রাদি নিয়ে পালিয়ে গেছে। অবশিষ্টাংশের মধ্যে দেখতে পেলাম তাঁর ব্যবহারের একটা কেটলি, একটা পানির কন্টেনার ও একটা পানির চোঙা তখনও পানি ভর্তি অবস্থায়, পড়ে আছে তাঁর ব্যবহারের জন্য মাত্র দুটো কম্বল, একটা গিলাপ কাপড় যা দিয়ে বালিশ বানানো, একটা পেন্ট, একটা শার্ট ও এক জোড়া মোজা গায়ে জড়ানো। তাছাড়া বহু পুরানো এক জোড়া জুতা, একটা পুরানো গেঞ্জি একটা লুঙ্গি ও একটা দেশীয় ঝোলা রয়েছে। ফেলে যাওয়া তাঁর সুটকেসটা খুলে দেখা গেল—অনেকগুলো বই, কিছু ঔষধ, একটা ডায়েরী ও একটা ছোট ফটো এলবাম ও পিন কলম কয়েকটা। দেখলাম তাঁর ডায়েরীর প্রথম পাতায় লেখা আছে "মহান জুম্মজনগণের আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক, সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জনগণ এক হও। জয় আমাদের হবেই হবে"। তাঁর প্রিয় ডায়েরীর সাথে আরো রয়েছে অনেকগুলো পেপার কাটিং, সেগুলো তিনি খুবই সযত্নে সংরক্ষণ করতেন। সংস্কৃতিবান ও ছিমছাম জীবনের অধিকারী প্রিয় নেতার এ্যালবামে দেখা গেল তাঁর অতি প্রিয় দু'টি সন্তানের ছবি, তাছাড়া ছাত্র জীবনের ও শিক্ষক জীবনের এবং এল এল বি পাশ করে এডভোকেট হওয়া কালীন তোলা সযত্নে রাখা ফটো। তাঁর সেই ছবিগুলো দেখে দীর্ঘদিন কারাভোগের পর দীঘিনালা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে প্রথম দেখা স্মৃতিগুলো আমাকে মনে করিয়ে দিল। এছাড়া আরো অনেকগুলো ফটো একের পর এক করে দেখছিলাম—তখন হঠাৎ একজন নীরবতা ভঙ্গ করে বলে উঠলো—"এমনিতে এ স্যার অতিরিক্ত দয়ালু। কি প্রয়োজন ছিল এ চক্রান্তকারী শত্রুদের ক্ষমা দেয়ার।" সে কথা শুনে অন্য একজন তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"দেখ ভাই, ভুল ধরলে অনেক কিছু পারা যায় নেতার মহৎ হৃদয়কেও দোষ দেয়া যায়। কিন্তু তাঁর এই ক্ষমাগুণ না থাকলে এতক্ষণে আমাদের কার কি অবস্থা হতো তার কি

ইয়ত্তা আছে। তাঁর মহৎ হৃদয় না থাকলে আমাদের শাস্তি পেতে পেতে মাথার চুলও চলে যেত। কত ধৈর্য্য ধরে তিনি আমাদেরকে বার বার বুঝাতেন, শিখাতেন তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তাধারা, তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি না হলে আমাদের এ জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটতো না, জুম্মজাতি এতক্ষণ ধ্বংস হয়ে যেত।" এ সব কথা শুনার পর ঐ দলের কম্যাণ্ডার বলে উঠলেন—" দেখ ভায়েরা, আমাদের এই মহান নেতার অবদান ও মহত্ব তাঁর শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারবে না। তিনি ছিলেন খাঁটি বৌদ্ধ তোমরা নিজেরাই তো জান তিনি একটা পিঁপড়াকেও মারতে দিতেন না। ঘাটের ইছা ও কাকড়গুলোকে মারতে দিতেন না বলে ওরা আমাদেরকে ভয় করতো না, পায়ের কাছে কাছে এসে আহার যোগাড় করতো। দেখ দয়া করলে পশু পক্ষীরা পর্যন্ত পোষ মানে। আজ নেতার এ মৃত্যুতে জাতি তার সবচাইতে বড় সম্মানিত সম্পদটাই হারালো। এ ক্ষতি কোন দিন পূরণ হবার নয়। তাঁর আন্দোলনের জ্ঞান, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, আইন ইত্যাদি সর্বজ্ঞানে গুনান্বিত মানুষ জাতি আর কোন দিন পাবে কিনা সন্দেহ। তোমরা দুর্বল হয়ো না ভায়েরা, বাস্তব জগত থেকে তার অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে কিন্তু তাঁর অবদান ও তাঁর অমরবাণী আমাদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এসো ভায়েরা নেতার মরদেহ ছুঁইয়ে আমরা নূতন করে শপথ নিই এই মহান নেতার স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়িত করবোই।" সবাই এক সাথে বলে উঠলো—"জনসংহতি সমিতি জিন্দাবাদ, শান্তি বাহিনী জিন্দাবাদ, জুম্মজনগণ দীর্ঘজীবি হোক। প্রিয় নেতার ঐতিহাসিক অবদান অমর হোক, অমর হোক"।

দেখতে দেখতে দিবসের শেষ ভাগ নেমে এলো। বিকেল ৫টা বেজে আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে গেছে। উপস্থিত জনতা ও বাহিনীর সদস্যরা মিলে মরদেহগুলো দাহন করার ব্যবস্থা নেয়া হলো। চারিদিকের উঁচু উঁচু পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আঁকা-বাঁকা হয়ে একটা ছড়া (ঝর্ণা) চলে গেছে। ছড়ার দুইধারে মাথা উঁচু উঁচু করে দাঁড়ানো তরুরাশির ছায়াই বহুলতাগুল্মের ঘেরা একটুখানি সমতল জায়গা। ঐ জায়গাটাই সাফ করে মরদেহগুলোর সমাধি বানানো হয়েছে। তারপর এক এক করে মরদেহগুলো শ্মশানে নিয়ে আনা হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে আনা হলে মেজর পেলের নেতৃত্বে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা ও উপস্থিত জনতা সবাই প্রথমে লীডারের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং পরে অন্যান্যদেরকেও করা হয়। তারপর জনতার পক্ষ থেকে অন্যান্য মরদেহগুলো পরিচয় করিয়ে দেবার অনুরোধ জানানো হয়। তখন দলের পক্ষ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন সদস্য সংক্ষিপ্তভাবে শহীদের পরিচিতি জানিয়ে দিলেন এইভাবে—এই হচ্ছেন আমাদের নিপীড়িত নির্যাতিত ও শোষিত জুম্ম জনগণের নেতা লার্মা। যিনি জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণ এনে দিয়েছেন। যিনি জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। দশ ভাষাভাষী জুম্ম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। জুম্ম জাতির জাগরণের অগ্রদূত, জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা চিন্তাবিদ, নিপীড়িত মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু মহান দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিবিদ আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তিনি দিয়ে গেছেন মুক্তির মন্ত্র। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের নেতা লারমা ভদ্র, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, স্নেহবৎসল, অতিথিপরায়ণ, সুশৃঙ্খল, কর্তব্যনিষ্ঠ, সদালাপী ছিলেন। তিনি বিবাহিত। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা। শোক সন্তপ্ত তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাই।

মেজর পরিমল বিকাশ চাকমার মরদেহ হচ্ছে এটি। ছাত্র অবস্থা থেকে তিনি বিলুপ্ত প্রায় জুম্ম জাতির কথা ভাবতেন। তাই ছাত্র জীবন থেকেই তিনি দেশ সেবায় আত্মনিমগ্ন ছিলেন। কলেজ জীবন শেষ করার পরই তিনি সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি একজন অতি বিশ্বস্ত, সৎ, বিনয়ী নিরলস দেশপ্রেমিক ছিলেন। দীর্ঘ এক যুগ ধরে তিনি প্রয়াত নেতার পাশে পাশে নিরাপত্তা ও সেবা শুশ্রূষার দায়িত্বভার নিজেই বহন করতেন। শত্রুরা সর্বপ্রথম তাঁর উপরেই গুলিবর্ষণ করেছিল। তিনি সদ্য বিবাহিত ছিলেন।

এই হচ্ছেন শুভেন্দু প্রবাস লারমা (তুফান)। তিনি প্রয়াত নেতার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই। মাত্র গতকাল তিনি প্রয়াত নেতার অসুখের খবর শুনে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন যুব সমিতির তিনি একজন আঞ্চলিক পরিচালক ও আঞ্চলিক কমিটির একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য। জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এ পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠতার সাথে পার্টি প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মিষ্টাবান ও জনদরদী মানুষ। তাঁর অঞ্চলের অনেক মানুষকে তিনি নিজের সম্পত্তি দিয়ে নিজের শক্তি দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। চক্রান্তকারী পলাশের ভাইদের যাবতীয় পড়াশুনার ভার তিনিই বহন করেছিলেন। কিন্তু বিধাতার নির্মম পরিহাস সেই পলাশচক্র তাঁর মরদেহের উপর অহেতুক গুলি বর্ষণ করে সারাদেহখানি ঝাঁঝরা করে দিয়ে গেছে। তিনি বিবাহিত। স্ত্রী পত্নী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে রেখে তিনি শহীদ হয়েছেন।

তারপরেই গ্রাম পঞ্চায়েৎ বিভাগের সহকারী পরিচালক অপর্ণাচরণ চাকমার (সৈকত) মরদেহখানি সবলের সামনে খুলে ধরলেন। সে সময় তাঁর পরিবারের আত্মীয় স্বজনেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ডান চোখের ভুরুতেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিল। তাঁকে দেখার সাথে সাথে তাঁর শোক সন্তপ্ত পত্নী, দুই ছেলে ও এক কন্যা হো-হো করে আর্তনাদ করে উঠলো। পিতৃহারা সন্তানেরা মায়ের বুক ছেড়ে বুক ফাটা ক্রন্দনে বাপকে ধরতে চায়—ধরণীর বুকে স্বামী হারা মা সন্তানদের করুণ আকৃতি দেখে মূর্ছাহত হয়ে পড়ে। এই মর্মভেদী দৃশ্য থেকে উপস্থিত লোকজন তাদেরকে বোঝাবার ভাষা হারিয়ে তারাও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। মা ও ছেলে মেয়েদের অবস্থা দেখে বায়াম্যেষ্ঠ কর্মীটি অস্থির হয়ে পড়েন এবং কোনমতে আত্মসংবরণ করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলেন তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ। খাগড়া ছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত ও ধৃত হন। তারা স্বামী স্ত্রী দু'জনেই ছিলেন দেশপ্রেমিক। একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও বুদ্ধি দীপ্ত এই বিপ্লবী বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার সাথে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব এযাবৎ সুষ্ঠুভাবে পালন করে গেছেন। রাঙ্গামাটি শাহ হাই স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় থেকে তিনি জুম্ম জনগণের জাতীয় সংগ্রামের মহান কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েন এবং পাহাড়ী ছাত্র সমিতির ছাত্র আন্দোলনে একজন পরামর্শদাতাও ছিলেন। তিনি সব সময় বৌদ্ধ ধর্মের নীতির সাথে দলীয় নীতির সমন্বয় সাধন করার জন্য চেষ্টা করতেন। আজই তাঁরই স্ব-বান্ধবদের সাথে মিলিত হবার কথা ছিল। কিন্তু সে মিলন আর হলো না। সমস্ত আত্মীয় পরিজনদের মন আজ রিক্ত হাহাকারে ভরপুর। আমরা তাঁর আত্মীয় পরিজনদের সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

কল্যাণময় খীসা (জুনি) ছিলেন হাসিখুশী স্বভাবের পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের আঞ্চলিক পর্যায়ে সহকারী পরিচালক ছিলেন। তৎপরে পার্টির আর্মোরার বিভাগেরও একজন সহকারী ছিলেন। তাঁর ডাক্তারী ও সেলাই কাজে অভিজ্ঞতা ছিল। ততক্ষণে তাঁর স্ত্রী পুত্রকন্যারা তথায় উপস্থিত হওয়াতে পরিস্থিতি আরো ঘণীভূত ও মর্মান্তিক হয়ে উঠে। শুধু ভগবানের নাম ডেকে উচ্চস্বরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন তাঁর অসহায়া পত্নী ও সন্তানেরা। এ হৃদয়ের রক্ত শুকিয়ে যাওয়া কান্নার সারা সমাধিক্ষেত্র মুহূর্তেই করুণ আর্তনাদে ভরে যায়। এই মর্মভেদী কান্নার মধ্যেই সন্তু লারমা বললেন—"মা, বোন ও বাপ ভায়েরা, আপনারা ধৈর্য্য ধরুণ, বাস্তবতাকে মেনে নেবার চেষ্টা করুন।" মৃদুভাষী, বিনয়ী, একনিষ্ঠ ও সরল মনের অধিকারী শহীদ জুনি মৃত্যুর আগেও প্রয়াত নেতাকে সেবা করে তাঁর স্বদেশ প্রেম, ধৈর্য্য ও সৎ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন। আমরা আজ এ মুহূর্তে অশ্রুজলে ও মনের কৃতজ্ঞতায় তাঁকে বিদায় দেব।

এই হচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি এ অনার্স কোর্সের ছাত্র সৎ, সাহসী ও একনিষ্ঠ সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট মনিময় দেওয়ান (স্বাগত) যিনি শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে বার বার পার্টিকে শত্রুর অনেক গোপন তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। পার্টি তথা গোটা জাতি এ জন্যে অনেক উপকৃত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বর্তমান জুম্ম ছাত্র সমাজের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং শান্তি বাহিনীর একজন বীর যোদ্ধা। শত্রুর বিরুদ্ধে ও দুঃসাহসিক কাজে তিনি ছিলেন পারদর্শী ও সুচতুর। শত্রুরা তাঁকে আটক করে নানাভাবে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও দুর্জয় মনোভাবের কাছে সে সবই পণ্ড হয়ে গিয়েছিল। তিনি যুব সমিতি ও ছাত্র সমিতির একজন সহকারী পরিচালক ছিলেন। দুঃসাহসী এই তরুণ যোদ্ধা চক্রান্তকারীদের মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে আজ মরেও অমর হয়ে রইলেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তাঁর এই মহৎ কৃতিত্ব আমাদের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

একজন সংগঠক কুশলী কর্মী হিসেবে সুপরিচিত এই সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট অমর কান্তি চাকমা (মিশুক)। তিনি একজন ভদ্র, বিনয়ী, একনিষ্ঠ, সুশৃঙ্খল দেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার কারণে ২ নম্বর সেক্টরের একজন জোন কম্যাণ্ডার হিসেবে আর.এম জোনের যাবতীয় বিশৃঙ্খলা ও জটিলতাকে পার্টি অনায়াসে সামলে উঠতে পেরেছিল। মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে তিনি খবর পেয়েছেন তাঁর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তাঁর একমাত্র নবজাত সন্তানের মুখ দর্শনে বঞ্চিত হয়ে তিনি এই চক্রান্তকারীদের গুলিতে শহীদ হলেন। সদ্যপ্রসূতা স্ত্রী তাঁর স্বামীকে হারিয়ে কি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রনায় দিন কাটাবেন তা আজ আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। তাঁর স্ত্রী ও নবজাত শিশুকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি।

সবচাইতে নীরিহ ও সরল প্রাণের অধিকারী কর্পোরেল অর্জুন ত্রিপুরা। তাঁর একনিষ্ঠতা, অধ্যবসায় ও সাহসিকতার কারণে

অল্প সময়ের মধ্যে কম্যাণ্ডার হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। ঘটনার সময় তিনি বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন চক্রান্তকারীদের উপর। মৃত্যুর আগে তিনি বিধবা মায়ের জন্য কিছু কাপড় যোগাড় করে রেখেছিলেন। চির দুঃখিনী তাঁর মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলেন। তিনি একজন সৎ, সাহসী, একনিষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর মাতৃ ভালবাসা ও বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। কম্যাণ্ডার অর্জুনের জীবন প্রদীপ আজ নিভে গেছে বটে কিন্তু তাঁর ত্যাগ, সাহসিকতা আমাদের সংগ্রামের পথে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। করুণ ও বেদনাঘন পরিবেশে সবাই আগুনের কুণ্ডলী হস্তে ধারণ করে দাঁড়িয়েছেন। শ্রদ্ধেয় সন্ত স্যার লীডারের মরদেহের পায়ে মাথা রেখে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছেন। সকলেরই মন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে; তবু তো দিতে হবে বিদায়। মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধা, মানুষের প্রেমপ্রীতি মায়া মমতা তার সমস্ত হৃদয়ের আকুতি দিয়ে প্রিয়জনদেরকে ধরে রাখতে চায়—তবুও তো যায় না রাখা। তারপর সবাই চিতায় অগ্নিসংযোগ করতে এলো। হে অগ্নিকুণ্ড! তুমি দ্বিধা হয়োনা। তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে এই বিদেহী পবিত্র আত্মাগুলো তুমি বরণ করে নাও। দেখতে দেখতে আগুনের প্রলয় শিখা হুস হুস শব্দে সব কিছুকে গ্রাস করে নিল। আমরা দেখতে পেলাম চির বিদায়ী অবিসংবাদিত নেতার দক্ষিণহস্ত অর্ধচন্দ্রাকারে উত্তোলিত হয়েছে যেন আগের মতই তাঁর সর্বশেষ নির্দেশ আমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এবার আর সেই অনলবর্ষী ভাষায় নয় শুধু হাতের ইশারায়...। হতভাগা জাতির স্বপ্নের একটি দেদীপ্যমান প্রদীপ উজ্জ্বল নক্ষত্র—যে নিজের আলো বিকিরিত করে জাতির তন্দ্রা ভেঙ্গেছে, বেঁচে থাকার বাসনা জাগিয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস দিয়েছে, বাস্তবে তিনি আর নেই। কিন্তু থাকবে তাঁর সেই অমর বাণী, সেই সংগ্রামী সোপান—যে সোপান বেয়ে জাতি তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

তারও দুদিন পর। বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহকে বিদীর্ণ করা তিনটা গুলির আঘাতে সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগের পর মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে কর্পোরেল সৌমিত্রের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল। তিনি ছিলেন সাহসী ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। অপার মাতৃস্নেহে লালিত কম্যাণ্ডার সৌমিত্র ছিলেন মায়ের পুঞ্জিভূত স্নেহের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলোতে তাঁর মায়ের করুণাসিক্ত হৃদয় পুত্র দর্শনের জন্য বড্ডো ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। তাই ঠিক হয়েছিল তিনি নিজে এসে প্রিয়তম সন্তানের মুখ দর্শন করে বিদগ্ধ হৃদয়কে প্রশমিত করবেন। ছেলেকে সোহাগ করে অন্তরের সমস্ত সত্তা দিয়ে আশীর্বাদ করে যাবেন। কিন্তু চক্রান্তের এই বিভীষিকা উত্তপ্ত মাতৃহৃদয়কে করে দিয়েছে আরো হাহাকার—ফেলে দিয়েছে সীমাহীন শোকসাগরে। মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে এই অদম্য দেশপ্রেমিক সন্তান মায়ের কথা তুললো না, কারোর জন্য কাঁদলো না, করলো না কোন অভিযোগ। মুমূর্ষু অবস্থায় শুধু বলে গেল—"দেশপ্রেমিক ভায়েরা, তোমরা দমে যেয়োনা, সত্য ও ন্যায় হচ্ছে আমাদের পথ। জয় আমাদের হবেই জয়, জ—য়, জ..."।

১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, একটা বিশ্বাসঘাতকতা, একটা ষড়যন্ত্র, কয়েকটা হাত বোমা ও কয়েক হাজার বুলেটই হলো নির্যাতিত নিপীড়িত জুম্ম জাতির ইতিহাসের কলংকিত উপকরণ, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত এই চক্রান্তকারীরা পাক-ভারতের মীরজাফর এবং লঙ্কার বিভীষণকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস তার আপন গতি থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। জাতীয় চেতনা কখনও ধ্বংস হতে পারে না। এই নির্মম ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে চক্রান্তকারীরা ভারিক্কী চালে ও দম্ভভরে পদচারণা করেছে, ডম্বি করে, লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে নিজেদের সাফাই গেয়েছে আবেগ ভরা উন্মাদিকতায়। কিন্তু সর্বত্রই নেতার হত্যার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে; বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। স্বার্থ ও ক্ষমতার সংঘাতের ফলে ঐ চক্রান্তকারীদের কতিপয় নেতা সদলবলে সশস্ত্রভাবে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পার্টির প্রচণ্ড আক্রমণে বিশৃঙ্খলা ও হতাশাগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। দলীয় কোন্দলে বিশ্বাসঘাতক দেবেনের অপমৃত্যু তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদেরকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছে। সে সময়ে পার্টি উপর্যুপরি প্রচণ্ড আঘাত দিচ্ছে যার ফলে চক্রান্তকারীরা হতাশায় জর্জরিত হয়েছে এবং তাদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়ে গিয়েছে। নিজের দলীয় লোকদের হাতে দেবেনের মৃত্যু ঘটনায় তাদের অভ্যন্তরস্থ এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ভয়াবহ রূপ আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতঃপর ষড়যন্ত্রের এই কালো হাত এবং রাজনৈতিক ব্যাভিচারিত্বকে জুম্ম জনগণের চিনতে আর বাকী থাকেনি। জনগণের ধিক্কার পেয়ে তারা এখন বন্ধ্যা, পঙ্গু ও ব্যাভিচারের সার্বিক অবস্থায়; সেদিন আর বেশী দেরী নেই যেদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড় তাদের স্বাগতম জানাবে।

যে ক্ষমতাশীল অগ্নদূত শুধু মাল হনন করে নয় উপরন্তু ঝর্ণা বানিয়ে জল প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম, জাতির

সেই কর্ণধারকে চক্রান্তকারীরা বারুদ ভূষণে ভূষিত করতে পারে বটে; কিন্তু গোটা আন্দোলনের মরিয়া প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আভ্যন্তরীণ দুর্ধর্ষ নদী প্রবাহ বালুকাময় পাড়কে ভাঙতে পারে কিন্তু প্রস্তরীভূত নদীর পাড় সেই ভাঙনকে অবশ্যই রোধ করতে পারে। ১০ই নভেম্বরের শহীদানের পবিত্র রক্তধারাকে সাক্ষী রেখে সত্য ও ন্যায়ের পথে সংগ্রামী ইতিহাস আপন গতিতে চলবে আর সেই সাথে শ্রদ্ধাচিত্তে চলবে জুম্ম জাতির করুণ মর্মবেদনাকে বয়ে নেয়া অন্তসলিলা ফল্গুধারা।

মৃত্যুঞ্জয়ী

শ্রী এস, ঘোস জার্নাল

মৃত্যুঞ্জয়ী! মহামানব তুমি সর্বজন শ্রদ্ধেয় নারায়ণ—মানবেন্দ্র,
জাগরণের অগ্রদূত, দিয়েছিলে স্বজাতির তরে মুক্তির মূলমন্ত্র।
একতাই বল, ঐক্যের প্রতীক দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্মজাতি
এসো সবে মিলে লাল ঝাণ্ডাতলে ঐক্যমত্তে মুক্তমালা গাঁথি।

তব এই পূতমন্ত্রে, মুক্ত আহ্বানে অনুপ্রাণিত আবাল বৃদ্ধ-বনিতা
তাই দিকে দিকে অনুকম্পিত ধরো অস্ত্র সবে, নহে আর পরাধীনতা।
মৃত্যুঞ্জয়ী! তুমি বিপ্লবী বীর যোদ্ধা, ক্ষুর ধার সংগঠক ও প্রশাসক,
জুম্মজাতি দেশ মাতৃকার মুক্তির অনন্য সৃষ্টিধর মহাসাধক।

তব অকৃত্রিম নিরবছিন্ন প্রয়াস, কঠোর গভীর মুক্তি সাধনা,
সৃজিল "জনসংহতি সমিতি" যেন সংগ্রামী প্রেরণার নিশানা।
দেশ-জাত প্রেমোদ্বুদ্ধ তব সৃষ্ট বীর "শান্তিবাহিনী" মুক্তির আলোকবর্তিকা,
বীর বাহুবলে ধরল যুদ্ধাস্ত্র, রক্তাক্ত সংগ্রামে খুঁজেছে মুক্তির বীথিকা।

গর্জে উঠেছে চারিদিক জুম্ম বীর মরদ বাচ্চাদের ভয়াল রণহুংকার,
আকাশে-বাতাসে মুহুর্মুহুঃ, ভম ভম রণদামামার বিকট ঝংকার।
তব দীক্ষায় অবারিত মুক্তি সংগ্রাম চলেছে—দুর্দম দুর্বার,
মুক্তি লাভের উল্লাসে রণমাদল বাজে ঢং ঢং চারিদিক জয় জয়কার।

হায়! পূর্বদিগন্তে রক্তিমা স্বাধিকার সূর্য উদয় প্রাক্কালে তুমি অন্তিম!
তবু তুমি—তব মহৎ স্মৃতি-অবদানে জাতির আঁখে চিরভাস্বর আদর্শ প্রতিম।
মৃত্যুঞ্জয়ী! মহাত্যাগী, নিঃস্বার্থে মুক্তি সংগ্রামে ত্যাজিলে তব মহাত্মা,
দেশ-জাতির মুক্তির তরে কি যে আত্মহুতি! দিয়ে গেলি মহৎ দীক্ষা।

তব এই মহান কৃতকর্মে রচিলে মহিমাময় মোহনীয় কীর্তি,
নিঃস্বার্থ নির্ভীক আত্মহুতি যেন তব মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণবন্ত মূর্তি।
তব মরণজয়ী সজীব প্রাণের মূর্তছবি যেন "জনসংহতি সমিতি",
তাই—তব কায়া-ছায়া, ভাষা-হাসি, আদর্শবাণী ভুলবেনা কোন দিন জুম্মজাতি।

জুম্ম শরণার্থী সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গে

—শ্রীউমং

১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশের বিভক্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জাতির দুর্ভাগ্যের সূচনালগ্ন। তৎকালীন বৃটিশ ভারতের বড় লাট লর্ড লুইস মাউন্ট ব্যাটেন, বেঙ্গল বাউণ্ডারী কমিশনের প্রধান স্যার সিরিল রেডক্লিপ ও লর্ড ইজমে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন—১৯৪৭ লংঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহুজাতি ও বহু ধর্মভিত্তিক ফেডারেল ভারতে অন্তর্ভুক্ত না করে ইসলাম ধর্মভিত্তিক মুসলমানদের জন্য সৃষ্ট পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করেন। অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি সূচনা করে অনুন্নত পশ্চাদপদ জুম্ম জাতীয় সত্তার উপর ইসলামী মৌলবাদী ও উগ্র বাঙ্গালী জাত্যাভিমানী শাসক গোষ্ঠীর চরম প্রবঞ্চনা ও উচ্ছেদমূলক অভিযান। তাই ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার সুপরিকল্পিতভাবে জুম্ম জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আর চলছে হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমান পরিবারকে এনে জুম্ম জনগণের ভূমি জবর দখলের অভিযান, জাতিগত নিপীড়ন, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চাপ সৃষ্টি, হয়রাণি, অত্যাচার, লুন্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ, অপহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ, ধর্মান্তকরণ, গণহত্যা তথা সর্বপ্রকার মানবাধিকার লংঘন। Dr. Bernard Nietschman, University of California (Barkeley) এর ভাষায়— "Rather than liberation and independence, the Chittagong indigenous nations were invaded by the Pakistani army and Bengali settlers 1947—1971, and by Bangladeshi army and Bengali settlers since 1971." তিনি আরো লিখেছেন :

"The Bangali military assisted invasion of the Chittagong Hill Nation is the world's most clear-cut example of genocide in practice today. Undeniably hungry Bengalis feed on food grown on land drenched in Chakma blood, Mro blood, Marma blood, Tripura blood. (Indonesia, Bangladesh : Disguised Invasions of Indigenous Nations —Third World Colonial Expansion).

পাকিস্তান আমল হ'তে গৃহীত এই সকল জুম্ম উচ্ছেদমূলক কার্যক্রমের ফলে জুম্ম জনগণ বারবার নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে বন-জঙ্গলে ও বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে অনেকে নিজ দেশে প্রবাসী হয়ে নিরাপত্তাহীন জীবন-যাপন অথবা গভীর অরণ্যে পলাতক জীবন যাপন করছেন। আর অনেকে চিরতরে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আর অর্ধ লক্ষাধিক জুম্ম শরণার্থী আজো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। জুম্ম জনগণের এই পরবাসী জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোকপাতই এই নিবন্ধের উপজীব্য।

বড় পরং Great Exodus

১৯৬৩ সাল। জুম্ম জনগণের স্মরণাতীতকালের বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ভারত ও বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ, জুম্ম জাতির ইতিহাসে যা "বড় পরং" নামে এক বিষাদময় স্মৃতি হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের ফলে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা "উপজাতি এলাকা" হরণের ফলে জুম্ম জনগণের উপর হয়রাণি শুরু হয়ে যায়। এ সময় মুসলমান বাঙ্গালীরা দলে দলে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও দাঙ্গা সৃষ্টির পাঁয়তারা করতে থাকে। বেসামরিক প্রশাসনেও জুম্মদের হেনস্থা করা চলতে থাকে। ফলে জুম্মদের জীবনে নেমে আসে জীবন ও সম্পত্তির অনিশ্চয়তা। এই অনিশ্চয়তার মুখে ১৯৬৪ সালে ৪০ হাজার চাকমা মিজোরাম সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। এরা সবাই ছিলেন বর্তমান বাঘাইছড়ি, লংগদু ও বরকল থানার উদ্বাস্তু। এই চাকমা শরণার্থীদেরকে ভারত সরকার তৎকালীন আসামের হাইলাকান্দির মনাছড়ি শিবির (২০ হাজার) ও ত্রিপুরার মাছলিসহ বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় প্রদান করেন। পরিশেষে এই চাকমাদেরকে তৎকালীন নেফা (NEFA) বর্তমান অরুণাচলে পুনর্বাসিত করা হয়। বর্তমানে এসব চাকমারা অরুণাচলের তিরাপ, লোহিত ও সুবনসিরি জেলায় নাগরিকত্বহীন জীবন যাপন করছেন। আগরতলা ভিত্তিক বুদ্ধিস্ট মাইনোরিটিশ প্রোটেকশন কমিটি ভারত তথা বিশ্বমানবতার কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে এক আবেদনে এই ঘটনা এভাবেই বর্ণনা করেন—In 1964, about 40,000 Chakma Buddhist migrated through Mizoram and Tripura. Neither Mizoram nor Tripura State accepted a single Chakma refugee. They were at last, sent to NEFA now Arunachal

Pradesh. But, within the last 14 years they could not acquire Citizenship of India and have not yet been enumerated in the electoral rolls. Moreover, for the last few years, Govt. of Arunachal Pradesh has been building various cases against the Chakma for their eviction on mass scale.

বড় পরং এর দ্বিতীয় দলে প্রায় ২০ হাজার মারমা বার্মার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করে। বর্তমানে এরা আরাকান প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

ত্রিপুরা ও মিজোরামে জুম্ম শরণার্থী ঃ

১৯৭৮ সাল। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে গুইমারা এলাকায় বি ডি আর-এর সঙ্গে শান্তিবাহিনীর এক সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনার প্রতিশোধ নিতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গুইমারা এলাকায় ব্যাপকভাবে অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধরপাকড় শুরু করে। ফলে এই অভিযানের হিংস্রতা এড়াতে ৫ হাজার মারমা (মগ) ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সর্বপ্রথম ১৪৬ জন মগ উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করলে তাদের পুশ ব্যাক করা হয়। এদের পরে আরও ২৩৩ জনকে পুশ ব্যাক করা হয়। কিন্তু এরপরও জুম্ম শরণার্থীরা সীমান্ত অতিক্রম করতে থাকে। পরিশেষে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার জুম্ম শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ ত্রিপুরার মনু, বংকুল, শিলাছড়ি, ঘোড়াকাপ্পায় এদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়। এ সালের ২৩শে জুলাই এর ভারত ও বাংলাদেশের এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ২৫শে জুলাই হতে এ শরণার্থীদেরকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইসব শরণার্থীরা জীবন ও সম্পত্তির নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে দেশে প্রত্যাবর্তনে অস্বীকার করলেও ২৫শে জুলাই হ'তে ভারত সরকার তাদেরকে জোরপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার দায়সারাভাবে এসব শরণার্থীদের গ্রহণ করে। এই প্রত্যাবর্তিত শরণার্থীরা কোন পুনর্বাসন ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ এবং বেদখলকৃত জায়গা জমি ফেরত পায়নি।

১৯৭৯ সালের ৭ই জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একই দিনে পূর্বাঞ্চলের রেংখ্যং উপত্যকা, সুবলং উপত্যকা ও ঠেগা উপত্যকার সর্বত্র এবং কর্ণফুলী উপত্যকার বরকল থানাধীন কয়েকটি ইউনিয়নে এক ব্যাপক সামরিক অভিযান চালায়। একমাস ব্যাপী এই অভিযানে সমগ্র এলাকাতে গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়। ফলে প্রায় ২০ হাজার জুম্ম এলাকা ত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার উদ্বাস্তু সীমান্ত পাড়ি দিয়ে মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদেরকে ডেমাগ্রি ও বড়পনছড়িতে আশ্রয় দেয়া হয়। কিন্তু তিন মাস পর এই শরণার্থীদেরকে আবার অনিশ্চয়তার মুখে স্বদেশে ফিরে আসতে হয়। মিজোরামের লুংলে জেলা প্রশাসক পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের নিকট তাদেরকে ঠেগা নদীর মুখে হস্তান্তর করেন। বাংলাদেশ সরকার এইসব শরণার্থীদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, তিন মাসের খাদ্য প্রদান ও পুনর্বাসনের আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতি রাখেনি। পরিবার পিছু ১০/২০ টাকা দিয়ে হতভাগ্য জুম্মদের ছেড়ে দেয়া হয়।

ঐ বছরের এপ্রিলে বাংলাদেশ আর্মির একদল সদস্য পানছড়ি থানাধীন কানুনগো পাড়ায় ৫ জন জুম্মকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। নিহত জুম্মরা হচ্ছেন সিন্ধু কুমার চাকমা, অনাবিল চাকমা, মোহন চাকমা, বকুল চাকমা ও অরুণকান্তি চাকমা। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ভীতসন্ত্রস্ত পুজগাং ও লোগাং এলাকার ৩ হাজার জুম্ম পরিবার চোমেলং ডুম্বুর হ্রদের ডায়েক (Dyke) এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ভারতীয় বি, এস, এফ এদেরকে সীমান্ত অতিক্রম করতে দেয়নি ও যারা অতিক্রম করে তাদেরকে পুশ ব্যাক করে।

একই সালের নভেম্বর মাসে শান্তিবাহিনীর একটি দল ভগবান টিলার টনক্কপাড়া বি ডি আর ক্যাম্পে এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে অধিকাংশ বি ডি আর সদস্যকে হত্যা ও ক্যাম্পের একাংশ দখল করে নেয়। এই আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে বাংলাদেশ আর্মি ও বি ডি আর বাহিনী তৎকালীন রামগড় থানাধীন বগাপাড়া, সর্বেশ্বরপাড়া, মনুদাসপাড়া, বাশদরসিং পাড়ায় এক জঘন্য অভিযান চালায়। ফলে এসব গ্রামের আনু-মানিক ২০ হাজার জুম্ম নিজ গ্রাম ছেড়ে দক্ষিণ ত্রিপুরার জলাইয়া ও ভগবান টিলায় আশ্রয় নেয়। ভারতীয় বি, এস, এফ এদেরকে পিটিয়ে পিটিয়ে পুশ ব্যাক করে। বি, এস, এফ-এর মারধরে বেশ কয়েকজন জুম্ম গুরুতরভাবে আহত হয়।

১৯৮১ সাল, মে মাস হতে বাংলাদেশ সরকার মাটিরাঙ্গা থানায় ব্যাপকভাবে মুসলমান বাঙ্গালীদের অনুপ্রবেশ ও সামরিক ছাউনি স্থাপন করতে থাকে। এই অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জুম্মদের ধান্য জমি ও বাগ-বাগিচা বেদখলসহ তাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও হয়রাণি শুরু হয়। এ সময় শান্তি-বাহিনী অনুপ্রবেশকারীদেরকে এক মাসের মধ্যে এলাকা ত্যাগ

করতে নির্দেশ দেয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার অনুপ্রবেশ অব্যাহত রাখে। অনন্যোপায় হয়ে শান্তিবাহিনী ২৪শে সেপ্টেম্বর '৮১, ২টি পুলিশ ক্যাম্প আক্রমণ ও তবলছড়ি হতে মাটিরাঙ্গা পর্যন্ত ২১ মাইলব্যাপী অনুপ্রবেশকারীদের বসতি জ্বালিয়ে দেয়।

এ আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে বাংলাদেশ সরকার তার সেনাবাহিনী, বি ডি আর, পুলিশ ও অনুপ্রবেশকারীদেরকে লেলিয়ে দেয় রামগড় মহকুমার সমগ্র মাটিরাঙ্গা এলাকা, বেলছড়ি ইউনিয়ন, তবলছড়ি ইউনিয়নের জুম্ম জনপদে। এ আক্রমণে যোগেন্দ্র চেয়ারম্যান পাড়ায় গুলি চালিয়ে অনেক ত্রিপুরাকে হতাহত করা হয় এবং সমগ্র এলাকায় জুম্ম ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এতে শতশত জুম্ম হতাহত ও নিখোঁজ হয়। ফলে হাজার হাজার জুম্ম পার্শ্ববর্তী চেঙ্গী ও মাইনী উপত্যকায় এবং অক্টোবর মাসে ২০ হাজার জুম্ম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসময় শরণার্থীদেরকে দক্ষিণ ত্রিপুরার বৈষ্ণবপুর, কাঁঠালছড়ি, শিলাছড়ি ও করবুক শিবিরে আশ্রয় দেয়া হয়। এ শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ৬ই নভেম্বর রামগড়ে বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক আলী হায়দার খান ও ভারতীয় দলের দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা প্রশাসক শ্রী শশী প্রকাশ। বৈঠকে ২৫শে নভেম্বর হ'তে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন শুরু করার সিদ্ধান্ত এবং একটি বিস্তারিত কর্মসূচীও গৃহীত হয়। বাংলাদেশ পক্ষ বৈঠকে শরণার্থীদের জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের গ্যারান্টি প্রদান করে। এরপর যথারীতি জুম্ম শরণার্থীদেরকে স্বদেশে ফেরত আনা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই সব শরণার্থীদের কোন পুনর্বাসন দেয়নি। তাদেরকে কয়েকদিন রেশন প্রদান করা হয় মাত্র। এ সময় তাদেরকে বিনা মজুরীতে সেনা ছাউনি ও রাস্তা মেরামত করতে বাধ্য করা হয় মাত্র। তাদের বেদখলকৃত জমি ফেরত দেয়া হয়নি।

১৯৮৪ সালের প্রথমদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বরকল থানায় জুম্ম অধিবাসীদের উপর অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙ্গালী, বি ডি আর ও আর্মিদের অত্যাচার, হয়রাণি, জমি বেদখল, ফসল ও বাগানের ফলমূল হরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। ২৯শে মে বরকল উপজেলার একজন ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় জুম্মদের জমি অনুপ্রবেশকারীদের বন্দোবস্তী দিতে গেলে জুম্মদের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং জমির মালিকদের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের কথা কাটাকাটি হয়। এর ফলশ্রুতিতে শান্তিবাহিনী ৩০শে মে ছোট হরিণা ও ভূষণছড়ায় অনুপ্রবেশকারীদের বসতি ও আর্মি ক্যাম্পে হামলা চালায়। পরদিন বাংলাদেশ আর্মি, বিডি আর ও অনুপ্রবেশকারীরা ভূষণছড়া ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের লুদিবাসছড়া, ওজ্যাংছড়ি, সুপারিপাদা, এরাতে ভোরেইয়া, গোরস্থান, ধনুবাগ প্রভৃতি জুম্মগ্রামে গণহত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ করে। এই ভূষণছড়া হত্যাকাণ্ডে ৬২ জন জুম্ম নিহত, ২জন আহত ও ৫ জন নিখোঁজ হয় এবং ১৮ হাজার জুম্ম নরনারী জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এদের মধ্যে ৪,৫০০ জুম্ম নরনারী ভারতের মিজোরামে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় লাভ করে।

এই সব জুম্ম শরণার্থীদের ২রা জুন আশ্রয় দেয়া হলেও এর তিন সপ্তাহ পর ভারত সরকার রেশন দিতে শুরু করে। কিন্তু মিজোরাম সরকারের বিরোধিতা ও অসহযোগিতার ফলে রেশন ও ঔষধপত্র সরবরাহ ও বন্টনে চরম অব্যবস্থা চলতে থাকে। ফলে শরণার্থীদের চরম দুরবস্থা ও নারকীয় যন্ত্রণার মধ্যে শিবিরে দিন যাপন করতে হয়। এভাবে তাগলকবাক ও ভিবিরা ঘাটে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের দেড় বছর শিবিরে অবস্থান করতে হয়।

এই সব জুম্ম শরণার্থীদেরকে যে দুর্যোগের মধ্যে মিজোরামে আশ্রয় নিতে হয়, তার চেয়ে বেশী দুর্যোগ ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে আবার মিজোরাম ত্যাগ করতে হয়। অত্যন্ত অমানবিক ও নির্দয়ভাবে এদেরকে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট এ শরণার্থীদের হস্তান্তরের সময় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। জুম্ম শরণার্থীদের সম্পূর্ণ অজান্তে তাদের প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। প্রত্যাবর্তনের দিন (২১শে জানুয়ারী '৮৬) ভারতীয় আর্মি ও বি, এস, এফ তাগলকবাক ঘেরাও করে ও একদল কেন্দ্রীয় পুলিশ (সি, আর, পি, এফ) মিজোরাম পুলিশ (এম আর পি) বাহিনী তাগলকবাক শিবির থেকে প্রত্যাবর্তনে অনিচ্ছুক জুম্ম শরণার্থীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদম মারপিট করতে থাকে। মেয়েদেরকে অশালীনভাবে টেনে হেঁচড়ে অপেক্ষমান লঞ্চের দিকে নিতে থাকে। সি, আর, পি, এফ ও এম, আর, পিদের এই আক্রমণে শরণার্থীরা এদিক ওদিক পালাতে চেষ্টা করলে ভারতীয় সেনা ও বি, এস, এফ সদস্যরা তাদেরকে ধরে সি, আর, পি, এফ ও এম, আর, পি-দের নিকট হস্তান্তর করে। সি, আর, পি, এফ ও এম, আর, পি সদস্যরা এই সব শরণার্থীদেরকে অমানবিক নির্যাতন করে অনেককে অর্ধমৃত ও আহত অবস্থায় বি ডি আরের নিকট হস্তান্তর করে। প্রচণ্ড

টানাটানি ও আক্রমণের ফলে ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় অনেক জুম্ম নারীকে বি ডি আরের লঞ্চে উঠানো হয়। এরূপ অকথ্য নির্যাতনের মুখে জুম্ম শরণার্থীদেরকে দেশে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা হয়। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে এই জুম্ম শরণার্থীদের আরো চরম ভাগ্য বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয়। শরণার্থীদের বহনকারী লঞ্চে জুম্ম যুবতীদেরকে ধর্ষণ ও পুরুষদের নির্যাতন করা হয়। এই শরণার্থীদেরকে বাংলাদেশ সরকার কোন পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ দেয়নি। তাদেরকে বেদখলকৃত জমিও ফেরত দেয়া হয়নি। অসহায়, সম্বলহীন ও নিঃস্ব এই জুম্ম উদ্বাস্তুরা শেষ পর্যন্ত জুম চাষের জন্য গভীর অরণ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

১৯৮৬ সাল, জুম্ম জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে দুর্যোগময় বছর। এ বছরেই বাংলাদেশ সরকার জুম্মদেরকে নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করার চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ সরকার জুম্মদের উপর ব্যাপক অত্যাচার, নির্যাতন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা শুরু করে। সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশকারীরা জুম্ম গ্রামে লুটপাট, জুম্ম বাগ-বাগিচা ও জমি-জমা বেদখল করতে শুরু করে। জুম্ম জনগণের উপর এই অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে শান্তিবাহিনী প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে এগিয়ে আসে। ফলে ২৯শে এপ্রিলে শান্তিবাহিনী মাটিরাঙ্গা থানার ভগবানটিলা বি ডি আর ক্যাম্প সহ কয়েকটি অনুপ্রবেশকারী গ্রামে আক্রমণ চালায়। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিচ্ছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী মাটিরাঙ্গা থানার সর্বেশ্বর পাড়া, মনুদাসপাড়া, তালুকদার পাড়া প্রভৃতি গ্রাম ও পানছড়ি থানায় গোলকপ্রতিমা, কালানাল, মির্জাবিল, লতিবান, সুতকর্মা পাড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি গ্রাম ও খাগড়াছড়ি শহরের সন্নিকটবর্তী মহাজনপাড়া ও পানখাইয়া পাড়ায় এক ব্যাপক আক্রমণ, গণহত্যা ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। বাংলাদেশ ঘাতকবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের এই আক্রমণে প্রায় ২ শতাধিক জুম্ম নর-নারী ও শিশু বৃদ্ধ প্রাণ হারায় ও সমসংখ্যক জুম্ম নর-নারী আহত ও পঙ্গু হয়ে যায়। এই সর্বাত্মক আক্রমণের সময় অর্ধ শতাধিক জুম্ম গ্রাম লুণ্ঠন ও জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়। এবছরেই সংঘটিত হয় পানছড়ি-খাগড়াছড়ি-মাটিরাঙ্গা হত্যাকাণ্ড (১লা মে), রামবাবুডেবা হত্যাকাণ্ড (১৮ই মে) চংড়াছড়ি হত্যাকাণ্ড (১৯শে ডিসেম্বর)।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের এই সর্বাত্মক উচ্ছেদমূলক আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের ফলে হাজার হাজার জুম্ম নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে ও সীমান্ত পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। মে মাস হতে উদ্বাস্তু ও সম্বলহীন জুম্ম নর-নারী সীমান্ত পাড়ি দিতে শুরু করে। কিন্তু ভারতীয় বি, এস, এফ এই উদ্বাস্তু আগমনের সর্বাত্মক বাধা প্রদান করতে এগিয়ে আসে। সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত বি, এস, এফ ব্যাটালিয়ন নিয়োগ করা হয়। সীমান্ত অতিক্রমকারী কয়েকটি অগ্রবর্তী দলকে বি, এস, এফ পুশব্যাক করতে সমর্থ হয়। এই পুশব্যাক করার সময় কয়েকজন নর-নারী বি, এস, এফের লাঠিচার্জে আহত হয়। বি, এস, এফ-এর এই পুশব্যাক সত্ত্বেও হাজার হাজার জুম্ম নর-নারী সীমান্তের দিকে এগুতে থাকে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সেনা সদস্যরা পলায়নরত জুম্ম নর-নারীদেরকে পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। একদিকে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর ধাওয়া অন্যদিকে ভারতীয় বি, এস, এফের পুশব্যাক জুম্ম উদ্বাস্তুদেরকে এক চরম দুর্দশায় নিপতিত করে। এমতাবস্থায় ১০ই জুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল সেনা দক্ষিণ ত্রিপুরার রইস্যাবাড়ী এলাকায় ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে পলায়নরত জুম্ম উদ্বাস্তু ও ভারতীয় বি, এস, এফের উপর গুলি বর্ষণ করে। এ সময় বি ডি আর ও বি, এস, এফের মধ্যে পর পর কয়েকবার গুলি বিনিময় হয়। এই গুলি বিনিময়ের সুযোগে কয়েক হাজার জুম্ম নর-নারী সীমান্ত অতিক্রম করে এবং শেষ পর্যন্ত বি, এস, এফ ভারতীয় সীমানা খুলে দিতে বাধ্য হয়। ভারতীয় সীমানা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে রইস্যাবাড়ী, চোমেলং, জলাইয়া, শিলাছড়ি, সাব্রুম ও করবুকে এই অসহায় ও সম্বলহীন জুম্ম শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়া হয়। সীমান্ত খুলে দেয়ার ২ মাসের মধ্যে ত্রিশ হাজারের অধিক জুম্ম শরণার্থী ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। বছরের শেষে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ হাজারে।

জাতি ভিত্তিক শরণার্থী সংখ্যা (৩০শে এপ্রিল' ৮৭)

শিবির	চাকমা	ত্রিপুরা	মারমা	সাঁওতাল	মোট
করবুক	৫,৫১১	১,১৬৩	২৯৩	৩৪	৭,০০১
শিলাছড়ি	৪,১৯৫	৪৭০	৩৫৬		৫,০২১
তাকুমবাড়ি	১৪,২৩৫	১,৫৭০	১৯২		১৫,৯৯৭
পঞ্চরামবাড়ী	৯,২৪৫	২২৭	২২৭		৯,৬৯৯
কাঁঠালছড়ি	১,১০০	৩,১৫৫	৬,৬৭৫		১০,৯৩০
	৩৪,২৮৬	৬,৫৮৫	৭,৪৪৩	৩৪	৪৮,৩৪৮

১৯৮৬ সালে জুম্ম জনগণের উপর বাংলাদেশ সরকারের অত্যাচার-নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় দেশের কিছু পত্র-পত্রিকায় ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরকারকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। ভারতীয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল প্রকার নির্যাতনের চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। নির্যাতিত ও অত্যাচারিত জুম্ম জনগণের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে ভারতীয় জনতা পার্টি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, সি, পি, আই (এম) রাজ্য কমিটি, কংগ্রেস (আই) রাজ্য কমিটি, ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি, ত্রিপুরা যুব কংগ্রেস, ট্রাইবেল স্টুডেন্ট ফেডারেশান, হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরাম, ত্রিপুরা বৌদ্ধ সংঘ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংগঠন। এই সকল সংগঠন বাংলাদেশকে সকল প্রকার নির্যাতনের জন্য তীব্রভাবে সমালোচনা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের দাবী করে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলি জুম্মদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সার্ভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল, IWGIA প্রভৃতি মানবাধিকার সংস্থা জনগণের উপর সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ব্যাপক প্রতিবাদ ও প্রচারণা চালাতে থাকে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার ৫টি শিবিরে আশ্রিত এই জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী নারায়ণ দত্ত তিওয়ারী ১৯৮৭ সালে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ঢাকা সফর করেন। এই সফরের সময় জুম্ম শরণার্থীদেরকে ১৫ই জানুয়ারী হ'তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যতিরেকে জুম্ম শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে অস্বীকার করে। ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সংস্থা এই প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখার আহবান জানায়। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সার্ভাইভাল, ইন্টারন্যাশনাল, এন্টি স্লেভারী সোসাইটি, IWGIA, বৃটিশ রিফিউজি কাউন্সিল প্রভৃতি বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থা শরণার্থীদের এই প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্তে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখার আবেদন জানায়। জুম্ম শরণার্থীদের সৌভাগ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, তাদের প্রত্যাবর্তনের অস্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার এই প্রত্যাবর্তন স্থগিত রাখতে বাধ্য হয়।

১৯৮৯ সাল। ১৯৮৬ সালে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীরা যখন ত্রিপুরার শিবিরগুলিতে অনিশ্চিত জীবন যাপন করছিল তখন আবার ২০ হাজার জুম্ম নরনারীকে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ত্রিপুরার শিবিরগুলোতে আশ্রয় নিতে হয়। জনসংহতি সমিতির সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৬টি বৈঠক ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব গতিধারায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানার্থে প্রবর্তন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ। এই জেলা পরিষদকে জনসংহতি সমিতি ও জুম্ম জনগণ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার ২৫শে জুন জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও বাস্তবায়নের জোর প্রস্তুতি নিতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে সরকার জুম্ম গ্রাম ভেঙ্গে দিয়ে জুম্মদেরকে নির্যাতনের জন্য বন্দীশিবির সদৃশ গুচ্ছগ্রাম, শান্তিগ্রাম ও বড়গ্রামে স্থানান্তর করতে থাকে। এইসব গ্রামে বসবাসে অনিচ্ছুক জুম্মদের গ্রাম, বসতবাড়ী ও বাগবাগিচা ধ্বংস করতে থাকে। ফলে দিঘীনালা, পানছড়ি ও খাগড়াছড়ি উপজেলায় হাজার হাজার জুম্ম পরিবার নিজ ভিটেমাটি, বাগ-বাগিচা ছেড়ে সীমান্ত পাড়ি দিতে শুরু করে এবং বছরের শেষ নাগাদ প্রায় ২০ হাজার জুম্ম নর-নারী দক্ষিণ ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সাংসদ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির প্রাক্তন উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা শ্রী উপেন্দ্র লাল চাকমা এ সময় ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহন করেন।

১৯৯২ সাল। জুম্ম জনগণের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটে এই সালে। ১৯৯০ এর শেষে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের সর্বপ্রথম সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান বি এন পি সরকার ক্ষমতায় এলেও জুম্ম জাতি উচ্ছেদমূলক পলিসির কোন পরিবর্তন হয়নি। তাই বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারের আমলে সংঘটিত হয় পর পর তিনটি হত্যাকাণ্ড-মাল্যা হত্যাকাণ্ড (২রা ফেব্রুয়ারী '৯২), লোগাং হত্যাকাণ্ড (১০ই এপ্রিল '৯২) ও ছোট জুলুং হত্যাকাণ্ড (৩০শে মে '৯২) এবং দু'টো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—রাঙ্গামাটি (২০শে মে '৯২) এবং দিঘীনালা দাঙ্গা (১৩ই অক্টোবর '৯২)। লোগাং হত্যাকাণ্ডে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দুই শতাধিক জুম্ম নর-নারীকে নির্মমভাবে হত্যা ও ৫ শতাধিক ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে মে মাসের মধ্যে ৩ হাজার লোগাং-বাসী জুম্ম ত্রিপুরার শরণার্থী শিবিরগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এদের শরণার্থীদের সরকারীভাবে তালিকাভুক্ত করা হলেও তাদেরকে কোন রেশন প্রদান করা হয়নি। ফলে অনেক আতঙ্কিত অসহায় জুম্ম নর-নারীকে আবার স্বদেশে ফিরে আসতে হয়েছে। তবে এখনো অনেকে শিবিরে মানবেতর দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে।

১৯৮৬—৯২ সালে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীরা এখনো ত্রিপুরার শিবিরগুলিতে অবস্থান করছে। এই শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের '৮৭ এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে ১৯৮৮—৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে রাজী করানোর জন্য ৫টি প্রতিনিধিদল ত্রিপুরায় প্রেরণ করে। কিন্তু এবার প্রচেষ্টা ছিল অত্যন্ত দায়সারা প্রকৃতির। এরপর ১৯৯০ এর গণ অভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তী বছর সর্বজন স্বীকৃত এক নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসেন। এতে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। পরিশেষে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সর্বশেষ উদ্যোগটি গৃহীত হয় গত মে মাসে। যোগাযোগমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী কমিটির আহবায়ক কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য ভারত সফরে আসেন এবং ৮ই জুন হ'তে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বলাবাহুল্য যে, এ প্রত্যাবর্তনে শরণার্থীদের কোন সম্মতি ছিল না। ফলে জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে ১৩ দফা দাবীনামা পেশ করেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার এই ১৩ দফা দাবীনামা পূরণে ব্যর্থ হলে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দ্বিতীয়বারের মত বাতিল হয়ে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য উগ্র ধর্মান্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদী শাসকগোষ্ঠী বিগত তিন দশক ধরে যে জঘন্য কার্যক্রম চালিয়ে আসছে তা আজ বিশ্ববিবেকের কাছে সুস্পষ্ট। তাই আজ বিশ্বের ৩০ টির অধিক আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী ও ধর্মীয় সংস্থা জুম্ম জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় এগিয়ে এসেছে। বিগত দেড় দশক ধরে জুম্ম জাতির উপর অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যার উপর সংবাদ বহু বুলেটিন ও বুকলেট প্রকাশ করে চলেছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা মিছিল ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বমানবতাবাদী এই সংস্থার এই নিরলস প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্ববিবেকের কাছে মানবাধিকার লংঘনকারী হিসেবে অভিযুক্ত।

প্রতিবেশী দেশ ভারতকে জুম্ম জাতির এই অস্তিত্বের সমস্যার সঙ্গে বার বার জড়িত হতে হয়েছে। অত্যাচারিত ও বিতাড়িত জুম্ম শরণার্থীরা বার বার ভারতে প্রবেশ করেছে। জুম্ম শরণার্থীদের বার বার আশ্রয় প্রদান, প্রত্যাবর্তন কিংবা পুশব্যাক করেও ভারত সরকার এই সমস্যার ধকলমুক্ত হয়নি। বস্তুতঃ এভাবে অসহায় জুম্ম শরণার্থীদেরকে গ্রহণ, প্রত্যাবর্তন কিংবা পুশব্যাক করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এই সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের। এই স্থায়ী সমাধানকল্পে দি টেলিগ্রাফ পত্রিকা ১২ই মে '৯৩ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে যথাযথ ভাবে লিখেছে — There is only one way to end this cycle of repression, exodus and return: the persecution of the tribal in the tracts must end.

বিগত তিন দশকে জুম্ম জনগণের বার বার ভারত ও বার্মায় আশ্রয় গ্রহণ ও প্রত্যাবর্তনের কারণ মূলতঃ জুম্ম জাতির উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা, রাজনৈতিক উৎপীড়ন, দমন ও শাসন এবং সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতিগত আক্রমণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জুম্ম জনগণ প্রত্যক্ষভাবে জাতিগত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ফলে জাতির ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষার্থে জনসংহতি সমিতি বিগত দু'দশক ধরে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে আসছে। আর এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমনার্থে ও প্রতিশোধ হিসেবে সরকারী সশস্ত্র সেনারা নিরীহ ও নিরপরাধ শত শত জুম্ম গ্রামবাসীকে বিনা বিচারে আটক, ধর্ষণ, লুন্ঠন, নিপীড়ন ও হত্যা সর্বোপরি অপারেশনের সময় অনুপ্রবেশকারীদেরকে জুম্ম গ্রামের উপর লেলিয়ে দিয়েছে। এবং অনুপ্রবেশকারীরা সরকারী সেনাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সংঘটিত করেছে পর পর ১০টি হত্যাকাণ্ড, লুন্ঠনের পর পুড়িয়ে দেয় শতশত জুম্ম গ্রাম। ফলে নিজস্ব বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বনে জঙ্গলে ও বিদেশের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া জুম্মদের আর কোন উপায় ছিল না।

এটা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি বাংলাদেশের একটি রাজনৈতিক সমস্যা। আর জুম্ম শরণার্থী সমস্যাটিও এর কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে উদ্ভূত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া জুম্ম শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এ যাবত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কেবল মাত্র জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যা মূল রোগের চিকিৎসা না করে উপসর্গের চিকিৎসার সামিল। এই সত্যতাকে অনুধাবন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের মাধ্যমে জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বাংলাদেশ সরকারের সদিচ্ছাই আজ জুম্ম জনগণের একান্ত প্রত্যাশা।

জুম্ম জাতীয়তাবাদ

—শ্রী জগদীশ

মানব সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের কোন কোন জাতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে আবার কোন কোন জাতি অতি দেরীতে অগ্রসর হতে পেরেছে। আবার অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতি যেমনি বিলুপ্ত হয়ে গেছে তেমনি অনেক ছোট-বড় জাতি স্বতন্ত্রভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে স্ব স্ব অস্তিত্ব সমুন্নত রেখে সকল ক্ষেত্রে বিকাশের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে আসন লাভে সমর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের অনেক পরাধীন জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ দ্রুত বিকাশমান। পক্ষান্তরে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা তথা সমগ্র বিশ্বের ত্রিশ কোটি জনসংখ্যার অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতি (Indigenous people) আজ চিরতরে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এসব বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মধ্যে অনেক জাতি সমষ্টিগতভাবে অথবা স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে মরণপণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইতিমধ্যে আজ নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করছে। আর অনেকেই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে শাসক-শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণও 'আজ জুম্ম জাতীয়তাবাদ' এর উন্মেষ ঘটিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ আজ সমষ্টিগতভাবে জুম্ম জাতি হিসেবে দেশে-বিদেশে পরিচিতি লাভ করেছে এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই জুম্ম জাতীয়তাবাদের মূল প্রবক্তা। জনসংহতি সমিতি তার প্রচারপত্রে, পত্রিকায়, বুলেটিনে এই 'জুম্ম' শব্দটি শুরু থেকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে আসছে। বিপরীতভাবে কিন্তু সরকারী বেসরকারী নথিপত্রে এ ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে এযাবত উপজাতি (Tribe) হিসেবে ভুল আখ্যায়িত করা হচ্ছে।

জুম ও জুম্ম জাতি

'জুম' থেকে 'জুম্ম'—এই জাতিবাচক শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। জুম্ম শব্দটি দুটো অর্থ নির্দেশ করে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে ধান, তিল, তুলা, মরিচ, শাকসব্জি ইত্যাদি এই সাথে কোন পাহাড় বা উচ্চভূমিতে চাষ করা হয়ে থাকলে সেই খাদ্য-শস্য পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্রকে 'জুম' বলা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মূলতঃ পাহাড় অর্থে 'জুম' শব্দটি বুঝানো হয়ে থাকে। তাই 'জুম' কথাটি 'পাহাড়' (উচ্চভূমি) শব্দের সমার্থক অর্থ নির্দেশ করে। 'জুম্ম' অর্থ হচ্ছে 'পাহাড়ের অধিবাসী' বা পাহাড়ী (High landers)। কিন্তু জুমচাষী (জুমিয়া) ও জুম্ম শব্দ দু'টি সমার্থক নয়। কেননা যারা জঙ্গল কেটে, আগুনে পুড়ে পাহাড়ে চাষ (Slash and burn cultivation or shifting cultivation) করে খাদ্যশস্য ফলায় তাদেরকে জুমচাষী (জুমিয়া) বলা হয়। পক্ষান্তরে যারা যুগ যুগ ধরে পাহাড় ও উচ্চভূমিতে বসবাস করে আসছে তাদেরকেই জুম্ম (পাহাড়ী) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অবশ্য অনেকের মতে, জুম্ম শব্দটি চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা শব্দ। পার্বত্যবাসী সকলকে চট্টগ্রামবাসীরা জুম্ম নামে অভিহিত করে। অন্যভাবে বলা যায় সকল পার্বত্যবাসীরা পাহাড়ে বাস করে বলে তাদেরকে এ নামে অভিহিত করা হয়। তাই জুম্ম বলতে মূলত পাহাড়বাসী বা পাহাড়ীকে বুঝানো হয়। Willem Van Schendel এর মতে —They (The people of the Chittagong hills were now called Jumma. An old pejorative term for swidden cultivation in the Chittagonian dialect of Bengali, it had been appropriated by the JSS in its attempt to unify all hill people under one social umbrella. P—26) [১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'জুম্ম' কথাটি কোন একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর একমাত্র ব্যবহৃত শব্দ নয়। ইহা সরকারীভাবে স্বীকৃত ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দ।

জুম্ম (পাহাড়ী) জাতি কথাটা শোনামাত্র নানা জিজ্ঞাসা ও সন্দেহ উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কারণ প্রায় তিন দশকের আগে জুম্ম জাতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কোথাও জানা বা শোনা যায়নি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ও কালের আবর্তে পরিবর্তিত বাস্তবতার আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন জাতির ন্যায় আজ পার্বত্য চট্টগ্রামেও "জুম্ম জাতি" ও "জুম্ম জাতীয়তাবাদের" উন্মেষ ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমী ও চাক—

দশ ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহই সমষ্টিগতভাবে আজ জুম্ম জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী অথবা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী সমষ্টিগতভাবে যে জাতি গড়ে তোলে সেই জাতির মধ্যে অবশ্যই অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকতে দেখা যায়। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্টগুলো উল্লেখযোগ্য—

(১) জাতি হলো, ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত একটি জনসমষ্টি আর এই জনসমষ্টি একটা নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগ ধরে বসবাস করে।

(২) এই জনসমষ্টির নির্দিষ্টভাবে বসবাসের জন্যে সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ড অর্থাৎ নির্দিষ্ট আবাসভূমি।

(৩) একই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারা।

(৪) ভাষাগত ঐক্য ও সাদৃশ্য অর্থাৎ জনসমষ্টির পরস্পরের মধ্যে ভাব প্রকাশের জন্য ভাষাগত মিল থাকা।

(৫) একই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অভ্যস্থ এই জনসমষ্টির মধ্যে একই মানসিক গড়ন উঠে। এই মানসিক গড়ন একটা সাধারণ সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়।

অতএব, উপরোক্ত বৈশিষ্টাসমূহের আলোকে জুম্ম, জুম্মজাতি ও জুম্ম জাতীয়তাবাদ নিছক কোন কথার কথা নয়, বরঞ্চ ইহা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাস্তবভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসীদের প্রকৃত পরিচিতি।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি

জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে ভাবগত ও বাহ্যিক উভয় প্রকার উপাদান বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বাহ্যিক উপাদানগুলির চেয়ে ভাবগত উপাদানটি অপরিহার্য ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঐতিহ্যগত ও ভাবগত ঐক্য—মূলতঃ ঐক্যবোধের ভিত্তি বাহ্যিক নয়, মানসিক। কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত ও বিকশিত একটি জনসমষ্টি জাতীয়তাবোধে গভীরভাবে জাগরিত হতে পারে। অধ্যাপক রেনা বলেন—The idea of nationality is essentially spritual in character. জুম্ম জাতীয়তাবাদেরও মূল ভিত্তি হচ্ছে এই ঐতিহ্যগত বা ভাবগত ঐক্য।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মরুং, বোম, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, খুমী ও চাক—এই ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের অধিকারী হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে তারা নিজেদের আবাসভূমি ও বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আলাদা অঞ্চল হিসেবে পরিচিহ্নিত করে আসছে। অতএব, জুম্ম জাতিসমূহের বৃহত্তর জাতি গঠন তথা জুম্ম জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রধানতম ভিত্তি হচ্ছে এই নির্দিষ্ট আবাসভূমি রক্ষার চিন্তা-চেতনা এবং অনুপ্রেরণা।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের অন্যতম ভিত্তি জাতিসমূহের অভিন্ন অর্থনৈতিক জীবনধারন পদ্ধতি— যা বৃহত্তর জাতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপাদান হিসেবে পরিগণিত। একদা পার্বত্য জাতিসমূহের প্রধান জীবিকা ছিল জুম চাষ। কালের আবর্তে জুম চাষ এখন গৌণ হলেও অঞ্চলের মোট আয়তনের নয় দশমাংশ জায়গা পাহাড়-ভুমি হওয়ায় পাহাড়ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতি এখনও প্রাধান্য বিস্তার করে আছে—যা বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থা তথা অর্থনৈতিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহ একই অর্থনৈতিক জীবন ধারায় একই সম্পূর্ণতার (a single whole) মধ্যে গ্রথিত হয়ে যুগ যুগ ধরে একে অপরের সান্নিধ্যে এসেছে এবং বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়তাবোধে বিকশিত হওয়ার ভিত্তি খুঁজে পেয়েছে।

যে কোন সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি সেই সমাজের সকল সামাজিক ক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র নিরুপণ করে। পার্বত্য জাতিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অভ্যাস, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকলেও অভিন্ন উৎপাদন প্রণালীর কারণে তাদের মধ্যে অভিন্ন মানসিক গড়ন গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম উর্বর ভুমি ও অঢেল সম্পদে পরিপূর্ণ। তাই অল্প ও সহজ পরিশ্রমে প্রচুর উৎপাদন সম্ভব। এই সহজ, সরল ও ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে গড়ে উঠে জুম্মদের সহজ সরল শান্তিপ্রিয় মানসিক গড়ন বা জাতীয় চরিত্র। পাশাপাশি এই মানসিক গড়ন জুম্ম তথা পাহাড়ীয়া জীবনধারা কেন্দ্রীক এক সাধারণ সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনধারা। পার্বত্য জাতিসমূহের মধ্যেকার সামাজিক মতায় বাহ্যিক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও বস্তুতঃ এদের মৌল উৎস জুম্ম অর্থনীতি তথা পাহাড়ীয়া জীবন প্রণালী। তাই আনুষাঙ্গিক ও মৌলগতভাবে বস্তুতঃ পার্বত্য জাতিসমূহের সংস্কৃতি অভিন্ন এক সম্পূর্ণতার (a

single whole) মধ্যে আবদ্ধ। দৈহিক তথা মানসিক গড়ন ও সংস্কৃতিক এই মৌলিকগত অভিন্নতাই বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে উর্বর করেছে।

জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপদান ভাষাগত ঐক্য পার্বত্য জাতিসমূহের মধ্যে অনুপস্থিত। অভিন্ন ভাষার উপাদান অনুপস্থিত থাকলেও বৃহত্তর জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দুর্বল হতে পারে না। তাই পার্বত্য জাতিসমূহের এই ভাষাগত বৈসাদৃশ্য বৃহৎ জুম্ম জাতীয়তাবাদের উত্তরণে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। নেদারল্যান্ডের ইরাসমাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক Willem Ven Schendel বলেন—It is difficult to see them as an ethnic group in the traditional, cultural sense ; they share neither a single language nor a single religion. The type of collective identity the term Jumma seeks to create is based more on social than on cultural characterstics, and the fact that the inhabitants of the Chittagong hills now frequently use the terms Jumma people and Jumma nation to refer to themselves indicates that a process of nation building is under way.
P—26 [2].

উল্লেখ্য যে, বর্তমান তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিশ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির পক্ষে এককভাবে সংগ্রাম করে বড় জাতিগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া স্মরণাতীতকাল থেকে একই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থানের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য, সংহতি ও সহাবস্থানের অবিচ্ছেদ্যতা গড়ে উঠে। তাই সম্মিলিত শক্তির সমাবেশ ঘটানোর অভিন্ন প্রয়োজনীয়তা ও শাসনতান্ত্রিক অবিচ্ছেদ্যতা জুম্ম জনগণকে বৃহত্তর জুম্ম জাতীয়তাবাদে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুপ্রাণিত করেছে।

সর্বোপরি জুম্ম জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠার আর একটা অন্যতম ভিত্তি হলো অভিন্ন শাসন-শোষণের শিকার। শত শত বছর জুম্ম জনগণ সকলেই জাতীয় সামন্ত প্রভুদের নির্মম ও অগণতান্ত্রিক শাসন-শোষণে সমভাবে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশ শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত দমনপীড়ন। এই শাসন-শোষণ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন জাতিসত্তাই রেহাই পায়নি। প্রত্যেকে সমভাবে সামন্তবাদ, উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। তাই তাদের মধ্যে এই অভিন্ন পরাধীনতা থেকে আশু মুক্তি ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার এক সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার জন্ম নেয় এবং বৃহত্তর রাজনৈতিক তথা জাতীয় চেতনায় সম্মিলিতভাবে উদ্বুদ্ধ হতে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহ অনুপ্রাণিত হয়।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

জুম্ম জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণ হিসেবে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করেছেন। Institute of Bangladesh Studies) এর গবেষক মোঃ মুহিবুউল্লাহ ছিদ্দিক এর মতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী সামন্তবাদী ব্যবস্থার উৎখাত করতে এই জুম্ম জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তাছাড়া তিনি কাপ্তাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত অধিবাসীদের অবহেলা, স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণে চাকমা যুবকদের বাধাদান, চীনপন্থী মনোভাব, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও নারী ধর্ষণের ক্ষোভ, পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবিধি রহিতকরণ প্রভৃতি জুম্ম জাতীয়তাবাদ উদ্ভবের কারণ বলে উল্লেখ করেন [৩]।

অন্যদিকে জুম্ম বিজয় চাকমা নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন। যথা— ১) বহিরাগত ও সামন্ত প্রভুদের শাসন-শোষণ, ২) কাপ্তাই বাঁধ, ৩) স্বাধীনতার পর ক্ষমতাসীন দলের গণবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি, ৪) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ইন্দন, ৫) উপজাতীয়দের আত্মরক্ষামূলক মনোভাব ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ, ৬) সরকারী উদ্যোগে বাঙ্গালী পুনর্বাসন, ৭) ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতৃত্বের ভাঙ্গন ও ৮) অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও জাতীয় নেতৃত্বের উদাসীনতা — [৪]।

উপরোক্ত আলোচনায় জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের কারণ হিসেবে বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলেও মূলতঃ রাজনৈতিক বঞ্চনা, অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই এর প্রধান কারণ।

রাজনৈতিক কারণঃ পার্বত্য জাতি সমূহের স্বকীয়তা ও অস্তিত্বে আঘাত হানা হয় সর্বপ্রথম ভারত বিভক্তির সময়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনকে লংঘন করে অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অন্তর্ভুক্তি তৎকালীন জুম্ম নেতৃবৃন্দ মেনে নিতে পারেনি। ফলস্বরূপ রাঙামাটিতে ভারতের পতাকা ও বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন জুম্ম নেতৃবৃন্দ। কিন্তু

পাকিস্তান সরকার বেলুচ রেজিমেন্ট পাঠিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম দখল করে নেয়।

পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির বিরোধী এই ঘটনা পরবর্তীতে জুম্ম জনগণের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা ঘটায়। তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণকে ভারত পন্থী বলে আখ্যা দিতে থাকে। শুরু হয় প্রশাসনিক বঞ্চনা। ১৯৪৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার করে বাঙ্গালী পুলিশ নিয়োগ করা হয়। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে জুম্ম জনগণকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। তদুদ্দেশ্যে গৃহীত হয় জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী বিভিন্ন পদক্ষেপ। এসময় ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি লংঘন করে বাঙ্গালী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়। কাপ্তাই বাঁধ তৈরী করে জুম্ম জনগণের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়। তদুপরি ১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি স্ববিধানুসারে সংশোধন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখলের দ্বার উন্মোচন করা হয়।

এরপর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জুম্ম জাতিসত্তাগুলির অস্তিত্ব চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী পানছড়ি ও দিঘীনালায় হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ চালায় ও আত্মসমর্পনকারী জুম্ম রাজাকারদের হত্যা করা হয়। তখন প্রকাশ্যে জুম্ম জনগণকে পাকিস্তানপন্থী আখ্যা দিয়ে রাজাকার, মুজাহিদ, মিজো দমনের নামে ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন চালানো হয় এবং শত শত জুম্মকে জেল-হাজতে পাঠানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এসময় এসব অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটির কাছে জুম্ম জনগণের জাতীয় সত্তা ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে ৪ দফা দাবীনামায় স্বায়ত্বশাসন দাবী করেন। কিন্তু তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার এসব দাবীসমূহ উপেক্ষা করে জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সংবিধান রচনা করে। জুম্ম জনগণের স্বকীয়তা ও অস্তিত্বের এই সাংবিধানিক অস্বীকৃতি জুম্ম জাতীয়তাবাদকে পরোক্ষভাবে উজ্জীবিত করে ও তারা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে আরো সচেতন ও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠে।

অর্থনৈতিক কারণ : জুম্ম জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের দ্বিতীয় কারণ হলো অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা। সুদূর বৃটিশ আমল থেকে জুম্ম জনগণ সমতলবাসী বহিরাগত ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দ্বারা চরমভাবে শোষিত হয়ে আসছে। বর্তমানেও পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবসা বাণিজ্য বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণে। সুদখোর বাঙ্গালী মহাজনদের নিকট জুম্ম জনগণ চরমভাবে শোষিত।

অর্থনীতির অন্যান্য উৎপাদন খাতেও জুম্ম জনগণ চরমভাবে বিপর্যস্ত। যেমন কাপ্তাই বাঁধের ফলে হাজার হাজার জুম্ম নিজ বাস্তভিটা ও জমি থেকে উচ্ছেদ হলেও কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে জুম্মদের চাকরী দেয়া হয়নি। অনুরূপভাবে কর্ণফুলী পেপার মিলে ১০/১২ জন জুম্ম নিয়োগ করা হয় মাত্র। কাপ্তাই হ্রদে জেলেদের পরিসংখ্যানে দেখা যায়— ১৯৭২-৭৩ সালে লাইসেনধারী জেলেদের মধ্যে ৩১% পাহাড়ী, ২৮·৪৯% বাঙালী হিন্দু ও ৩৯·৫৫% মুসলমান। কিন্তু ১৯৯০ সালে জেলেদের অনুপাত দাঁড়ায় পাহাড়ী ১% হিন্দু ২৬% ও মুসলমান ৭৩% [৫]।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী (১ম-৪র্থ) শ্রেণীর নিয়োগ ক্ষেত্রে জুম্মরা সংখ্যালঘু। তবে ইদানিং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জুম্ম কর্মচারীর আনুপাতিক হার কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

আর ১৯৫৯-৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে বিশেষ করে চাকমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়। এ বাঁধের ফলে ১ লক্ষ অধিবাসী উদ্বাস্তু ও হাজার হাজার পরিবারে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। কৃষকদের নূতন বসতি এলাকায় অর্ধেকমাত্র জমি দেয়া হয়। উদ্বাস্তুদের সঠিক পুনর্বাসন দেয়া হয়নি।

এরূপ অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার ফলে জুম্ম জনগণ ভূমিহীন ও তাদের মধ্যে একটা অংশ সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হতে থাকে। এই নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক ক্রমাবনতির ফলে জুম্ম জনগণ তাদের অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার প্রতি সচেতন হয়ে উঠে। এভাবে অর্থনৈতিক কারণে জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রেরণার সূচিত হয়।

ধর্মীয় ও অনুপ্রবেশ : পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মরা বিগত শতাব্দীগুলিতে ভিন ধর্মের অনুসারী হলেও সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে এসেছে। একমাত্র ধর্মীয় কারণে জাতিগুলির মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হয়নি। প্রত্যেক ধর্মানুসারীরা নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে এসেছে। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে বাঙ্গালী মুসলিমদের পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশের পর জুম্ম ও অজুম্মদের মধ্যে

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে বিরোধ দেখা দিতে থাকে। বিশেষ করে সেই সময়ে বাজারে শুকরের মাংস বিক্রির ব্যাপারে রেংখ্যং, লংগদু ও নান্যাচর প্রভৃতি বাজারে জুম্ম অজুম্মদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। পরবর্তী কালে অনুপ্রবেশের ফলে বাঙ্গালী মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির ফলে এই ধর্মীয় সংঘাত ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে হাজার হাজার বহিরাগত পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখল করতে থাকে। অসাধু সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে ভূয়া ভূমি দলিল তৈরী, হয়রানী করে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা, সামান্য ঋণকে বহু গুণ বাড়িয়ে জমি জবর-দখল এভাবে অনুপ্রবেশকারীরা জমি বেদখল করে নেয়। এই ব্যাপক অনুপ্রবেশ ও ব্যাপক জমি বেদখলের ফলে জুম্ম জনগণ অসহায় ও ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় জুম্ম জনগণ অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে এবং একতাবদ্ধ হয়ে তাদের প্রতিরোধে সচেষ্ট হয়। এভাবে ধর্মীয় ও ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রস্ফুটিত হয় জুম্মদের মধ্যে।

জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে (২রা নভেম্বর ১৯৭২ইং) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন "পার্বত্য চট্টগ্রামে আমরা দশটি ছোট ছোট জাতি বাস করি। চাকমা, মগ(মারমা), ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি রিয়াং মুরুং ও চাক—এই দশটি ছোট জাতি সবাই মিলে আমরা নিজেদেরকে পাহাড়ী বা জুম্ম জাতি বলি।" পরবর্তীতে ...তিনি তাঁর বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসমূহকে জুম্ম নামে অভিহিত করতেন। একমাত্র এই 'জুম্ম' নামের দ্বারা পার্বত্যাঞ্চলের সকল জাতিসমূহকে সহজে বুঝানো যায়। তাই এই জুম্ম নামটি প্রগতিশীল ও সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা লাভ করে ও সাধারণ কথাবার্তা ও সভাসমিতির আলোচনায় ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীতে জনসংহতি সমিতি বিভিন্ন প্রচার পত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহকে সমষ্টি গত ভাবে জুম্ম জাতি হিসেবে অভিহিত করে।

জুম্ম শব্দটি মূলত: দশ ভাষাভাষী জাতিসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিকগত ঐক্যের প্রতীক এবং সমষ্টিগত জাতীয় স্বকীয়তার নির্দেশক। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের প্রবল উল্লাসে ম্রিয়মান সাংস্কৃতিক উজ্জীবিত করতে পার্বত্য জাতিসমূহ সচেতন হয়ে উঠে। বাংলা ভাষার পাশাপাশি পার্বত্য জাতিসমূহ নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিতে নূতন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটাতে সক্রিয় হয়ে উঠে। গঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক সংস্থা—যেমন—গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী, জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর ইত্যাদি। রচিত হয় জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা। সেই সাথে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে দেখা দেয় জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপকতাবে ব্যবহার। Willen Van Schendel এর ভাষায়— A remarkable cultural innovation occured which was reflected in the emergence of a new term to designate the people of the Chittagong Hills. They were now called Jumma. তিনি আরো লিখেছেন— The Jumma identity does not signify a return to the old Burmese cultural model ; rather it is the first serious attempt to develop an indigenous model of state society and culture ... Attempts to revive the local linguistic heritage can also observed, e, g. in a trend towards giving new born babies Jumma names instead of Bengali names that were fashionable a generation ago [৬].

কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ ও স্বাতন্ত্র্যতাকে আন্তর্জাতিকভাবে অস্বীকার করে আসছে। বাংলাদেশের জেনেভাস্থ স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাকলে আর ওসমানি আগষ্ট ৯২ এর জেনেভাতে অনুষ্ঠিত UN Sub-Commission of on prevention of discrimination and protection of minorities এর সম্মেলনে বলেন যে, The people of the hill districts of Chittagong do not defer racically ; religiously and economically from the people of other parts of Bangladesh. Race is a concept established by science —biological and anthropological. Both these discipline would bear out that the people of Bangladesh constitute one race—a mixed race. আর জুন '৯৩ এর জিভেনা আদিবাসী সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি বলেন যে, There is no tribe in Bangladesh called Jumma.

বাংলাদেশের অভ্যন্তরেও বাংলাদেশ সরকার আজ এই জুম্ম জাতীয়তাবাদকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতিতে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম

দিয়েছে। কিন্তু পার্বত্য জাতিসমূহের আজ বুঝতে বাকী নেই যে, তারা বহিরাগতদের দ্বারা নিজ দেশে পরবাসী হতে চলেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের বেদখলে চলে যাচ্ছে, তাদের স্বকীয়তার ও অস্তিত্বে চরম আঘাত এসেছে। একমাত্র সকল জাতিসমূহের সংঘবদ্ধ আন্দোলনই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার উপায়। আর এই আন্দোলন গড়ে তোলার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে জুম্ম জাতীয়তাবাদ। সকল পাহাড়ী জাতিসমূহের ঐতিহ্য, সমতা ও একতার প্রতীক জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় আজ সকলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার—শ্রী রবি)

তথ্য নির্দেশ

[১], [২] The Invention of the 'Jummas'

ও [৬] State Formation and Ethnicity in Southeastern Bangladesh

Willen van Sehendel
Department of History
Erasmus Univercity, Rotterdam
Netherlands.

[৩] লোক (৩) বাংলাদেশ জাতিসত্তা সংকট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ।

[৪] সংস্কৃতি, সংখ্যা ২৫তম, পৌষ ১৩৯৭, ডিসেম্বর ১৯৯০।

[৫] ঐ

"কি, তোমাদেরকে ক্ষমা করে আমরা কি অন্যায় করেছি? আমাকে কিংবা তোমাদের বন্ধুদের মেরে জাতি কি মুক্ত হবে? যাক তোমরা প্ররোচিত ও উত্তেজিত হয়ে যাই করোনা কেন জাতির দুর্দশাকে তোমরা কখনও ভুলে যেও না আর জাতির এ আন্দোলনকে কখনও বানচাল হতে দিও না ..।

— এম এন লারমা

[মুমূর্ষু অবস্থায় ষড়যন্ত্রী আততায়ীদের প্রতি]

নূতন প্রজন্মের চেতনা

—শ্রী পেলে

পুরোনো প্রজন্মের সামাজিক অবস্থান

মানবসমাজের বিবর্তনের যে ধারা তা পুরোনো জুম্ম সমাজের খুব সম্ভব বজায় ছিল। আধুনিক ইতিহাসে সামন্ত রাজাদের অস্তিত্ব অন্ততঃ তাই প্রমাণ করে। কিন্তু সামন্ত সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক যে নিয়ম তা বজায় থাকতে পারেনি। সামন্ত সমাজে গোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং শুরু হয় নগর পত্তন। সমাজের গর্ভে লালিত এই ভ্রূণ এক সময় বিকশিত হয়ে এই সমাজকে ভাঙতে শুরু করে। ফলে শ্লোগান উঠে গণতন্ত্রের ও জাতীয়তাবাদের। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সামন্ত সমাজ এইভাবে ভেঙ্গে বুর্জোয়া সমাজ গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত কিন্তু জুম্ম সমাজে বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তার বিশেষ কারণ হচ্ছে বহিরাগত আক্রমণ। তাই পুরোনো প্রজন্মের চেতনায় গণতন্ত্রের বীজ রোপিত হতে পারেনি এবং জাতীয় চেতনাবোধেরও উন্মেষ ঘটাতে পারেনি।

আধুনিক গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী দীর্ঘদিন যাবত এ সমাজে হস্তক্ষেপ করলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন প্রবর্তন করতে তৎপর হয়নি। শুধুমাত্র সামন্তবাদের সাথে আমলাতন্ত্রকে যোগ করে তার স্বার্থ উদ্ধার করেছে। সেই বৃটিশ শাসনের শেষ পর্বে এসে একদল উদীয়মান তরুণ গণতন্ত্রের চর্চা করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের মহীরুহে না ছিল শিখর না ছিল কোন ডালপালা। সুতরাং তখনকার ভারতীয় রাজনীতিবিদদের অবহেলা ও পাকিস্তানী রাজনীতিবিদদের অবজ্ঞা আর জুম্ম তরুণদের গণতন্ত্রের পতন সমান অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো।

নূতন প্রজন্মের আবির্ভাব

ষাট দশকের পুরোনো প্রজন্মের ব্যর্থতার গ্লানি থেকে জন্ম নিয়েছিল নূতন প্রজন্ম। তখন যে কোন ধরণের রাজনীতিতে অংশ নেয়ার অর্থ ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাই সাংস্কৃতিক আন্দোলনে মনোনিবেশ করে এই প্রজন্ম। শ্লোগান ছিল 'গ্রামে ফিরে যাও'। উদ্দেশ্য ছিল—হাজার হাজার গ্রাম্য অশিক্ষিত শিশু কিশোরদের শিক্ষিত করা। আসলে ছিল শিক্ষা আন্দোলন। আর চেতনায় ছিল জাতীয় জাগরণ।

নূতন প্রজন্মের রাজনীতি

সত্তর সালের জাতীয় পরিষদ ও গণপরিষদের নির্বাচন সেই শিক্ষা আন্দোলনের নেতাদের সামনে রাজনীতির এক দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। "পার্বত্য চট্টগ্রাম নির্বাচন পরিচালনা কমিটি" নামে তখন শুরু হয় সর্ব প্রথম গণতন্ত্র চর্চার পদযাত্রা। তার পরেই একাত্তরের ভয়ার্ত ঘটনাপ্রবাহ অত্যাচারের স্টিম রোলার চলতে থাকে জুম্ম সমাজের উপর। নূতন প্রজন্ম জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত হতে থাকে।

'৭২ সালের নব্য রচিত সংবিধানে জুম্মদের 'রক্ষাকবচ' এক কলমের খোঁচায় অদৃশ্য হয়ে পড়ে। ফলতঃ জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার নৃশংস প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। নবসৃষ্ট বাংলাদেশের আকাশে তখন রাজনীতি চর্চার ঘনঘটা। বহু প্রগতিশীল রাজনীতির গরম ও তরতাজা বক্তব্য নূতন প্রজন্মকে প্রভাবিত করতে থাকে। এই প্রজন্মেরই উদীয়মান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তিনি ছোট বড় অনেক রাজনৈতিক দলে ধর্ণা দিয়েছিলেন। বক্তব্য তাঁর সুস্পষ্ট: "জুম্ম জাতিকে ধ্বংস করার অপ্রতিরোধ্য চেষ্টা চলছে। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সাহায্য করুন।" তখন অনেক রাজনৈতিক নেতারা মুখে জুম্ম জাতির এ ধ্বংশ হয়ে যাওয়ার বাস্তবতাকে স্বীকার করেন কিন্তু কার্যতঃ সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি কেউ। শুধুমাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন।

নূতন প্রজন্মের নিজস্ব চেতনা

তখন জুম্ম সমাজের উদীয়মান তাত্ত্বিক নেতা লারমা। তার রাজনৈতিক তত্ত্ব ছিল এইরূপ—"বাংলাদেশের সংবিধানে জুম্ম জনগণের কোন অধিকার সংরক্ষণ করা হয়নি। আগের যে সাংবিধানিক 'রক্ষাকবচ' ছিল তাও এক কলমের খোঁচায় বাংলাদেশ সরকার বিলোপ করে দিয়েছে। আমরা অধিকারের জন্য দাবী পেশ করলাম, কিন্তু কর্ণপাত করা হলোনা। বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রগতিশীল রাজনৈতিক পার্টি আছে। তারা যদি ক্ষমতায় আসতে পারতো তাহলে আমাদের অবশ্যই অধিকার প্রদান করতো। এইসব প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল হয়তো এক

দিন ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু কখন যে শক্তিশালী হয়ে ক্ষমতা লাভ করবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাদের সেই শক্তি অর্জন করতে হয়তো চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর এমনকি একশো বছরও লেগে যেতে পারে। কিন্তু জুম্ম জাতি ততক্ষণে ধ্বংস হয়ে যাবে। এই আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আমাদেরকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরণপণ সংগ্রাম করতে হবে। আর বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দল যেহেতু আমাদের সাহায্য করার জন্য কর্মসূচী ভিত্তিক এগিয়ে আসেনা সেইহেতু আমাদেরকে নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে। আর তার মাধ্যমে সংগ্রাম করেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আর এই রাজনৈতিক বক্তব্য গ্রহণ করে প্রজন্মের একটি অংশ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' গঠন করে। আর অন্য একটি অংশ বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টিতে যোগদান করে। কিন্তু যে অংশটি বাংলাদেশের রাজনীতির বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছিল তারা কার্যতঃ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে সাময়িক সান্ত্বনা পেলেও নিজস্ব জাতির সীমাহীন অত্যাচার উৎপীড়নের তাড়নায় তারা প্রায় সময়েই দিকভ্রান্ত হয়ে রাজনীতি বিমুখ কিংবা সরকারী দালালে পরিণত হয়েছে। আর যে অংশটি লারমার এই রাজনৈতিক তত্ত্বকে গ্রহণ করেছে তারা নব্বই দশকে এসেও দাবী করতে পারে তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এটাই বাস্তবসম্মত।

নূতন প্রজন্মের গণতন্ত্র চর্চা

স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগের রাজনীতিতে প্রবল জোয়ার। সেই জোয়ারে বাংলাদেশের অনেক বিরোধী দলের অবস্থা ছিল অনেকটা কোণঠাসা। কিন্তু এত দাপট সত্ত্বেও আওয়ামীলীগ পার্বত্য চট্টগ্রামে গণতান্ত্রিক যুদ্ধে চরমভাবে হেরে যেতে বাধ্য হয়। এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে তখনকার বাংলাদেশ সরকার গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে দুই ধরণের অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। তার একটি হচ্ছে—অঞ্চল বিশেষের জনমতকে প্রাধান্য না দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশ ভিত্তিক গণতন্ত্রের চরম প্রাধান্য দেওয়া। এর উদ্দেশ্য জুম্ম জনগণকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার না দেওয়া। আর যেহেতু জুম্ম জনগণের জন্য সমগ্র জাতীয় পরিষদে মাত্র দুইটি আসন (বর্তমানে তিনটি) সেহেতু জুম্ম জনগণের এই পদ্ধতিতে লড়াই করার কোন সুযোগ থাকেনা। তার অর্থ হচ্ছে জুম্ম জনগণকে গণতন্ত্র চর্চা করতে না দেওয়া ও প্রকারান্তরে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—সর্বনিম্ন পর্যায়েও জুম্ম জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার না দেওয়া। তার জন্য সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র বেআইনী-ভাবে বসতি দিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে যে গণতান্ত্রিক চর্চা চলে তাও বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। বস্তুতঃপক্ষে বাংলাদেশ সরকার আরো নগ্নভাবে 'বাকশাল' গঠনের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকাশ্যে গণতন্ত্র চর্চা করার সমস্ত সুযোগ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এই নূতন প্রজন্ম গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জুম্ম জনগণকে অবাধে গণতন্ত্র চর্চার পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ফলে এই প্রজন্ম আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে।

যে পার্টিতে গণতন্ত্রের চর্চা নেই সেই পার্টি সহজেই জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ সরকার একের পর এক কত সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সে সবের প্রত্যেকটির মধ্যে জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণ না থাকায় সবগুলোই ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করে দিয়ে জনগণ থেকে পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার মহা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু বিগত চার বছরেও পার্টি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন তো হয়নি বরঞ্চ আরো জনগণের একান্ত প্রিয় সংগঠন হিসেবে শক্তি অর্জন করে চলেছে।

অথচ পার্টি গ্রাম পর্যায়ে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 'গ্রাম পঞ্চায়েত' গঠন করে দিয়েছে তা এত বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়েছে যে শত অত্যাচার নির্যাতন চালানোর পরও সরকার সেই গ্রাম পঞ্চায়েতকে কখনও ধ্বংস করে দিতে পারেনি। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনগণের মতামতের প্রতিফলন অবশ্যই থাকতে হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে—পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রকাশ্যে না হলেও মনে মনে সমর্থন করে না এমন জুম্ম শতকরা একজনও পাওয়া যাবে না। জুম্ম জনগণের জন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টি দরকার—এই বক্তব্যের সাথে প্রতিটি সচেতন জুম্মই মনে প্রাণে একমত। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে নেওয়ার দাবীকে সমর্থন করে না এমন জুম্ম নারী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনগণের এই নিজস্ব মতামতকে এই পর্যন্ত কোন সরকার কি মেনে নিতে পেরেছে?

সরকার পার্টিকে যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে। কত কুৎসা রটায়। হাজারো অপপ্রচারণা চালায়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার দাবী শুধু জুম্ম জনগণের

নয় বরঞ্চ বলা যায় সমগ্র বাংলাদেশের অনেক মানুষেরও দাবী, তাসত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকারের সেই দাবী মেনে নেয়া কি সম্ভব হয়েছে? এত বছর পরে সরকারের সীমাহীন অত্যাচারের মধ্যে পার্টি কেন এত অক্ষত রয়ে গেল— তার কারণ পার্টি জনগণের মতামতকে সম্মান করে চলে।

জিয়া-এরশাদ শাহীর আমল ছিল পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। এই আমলে জুম্ম জনগণকে প্রকাশ্যে গণতন্ত্র চর্চা করার কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই দুই সামরিক জান্তার আমলে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপন যুদ্ধে জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে—এই সামরিক জান্তাই ব্যর্থ জিঞ্জির গলায় পরিয়ে বিদায় নিয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে জনগণের নিজস্ব মতামত কত দুর্বার, কত শক্তিধর। জনগণের সেই শক্তিই হচ্ছে নূতন প্রজন্মের সৃষ্ট গণতন্ত্রের শক্তি। এই শক্তির হার মানাতে বর্তমান সরকারকেও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশে লড়াই করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই। কিন্তু সে সাধ্য কি সরকারের আছে?

নূতন প্রজন্মের উত্তরাধিকারী

নূতন প্রজন্মের বলিষ্ঠ চেতনা হচ্ছে জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ। এই চেতনাকে সম্বল করে প্রতিটি দশকে যোগ্য উত্তরাধিকারীরা সংগ্রামে সামিল হয়েছে। অবশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে অসম যুদ্ধে—কঠিন সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে এই উত্তরাধিকারীরা তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি ভাগ শত্রুর ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের ধারক ও বাহকদের লেজুড় বৃত্তিতে মনোনিবেশ করে। তাদের অধিকাংশের অবস্থা খেলার পুতুলের বেশী মর্যাদা পায়নি। আর ছোট্ট একটি অংশ নকল পায়ে রাজপুরুষ বেশে অভিনয়ের জন্য রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের অবস্থান দুধের পেয়ালার লেহন করা আর ভ্রুর উচিয়ে ধরা লাঠির মাঝামাঝি অবস্থান থেকে বেশীদূর যেতে পারেনি।

দ্বিতীয় ভাগটি জাতির দুর্ভাগ্যের শিকার। তারা নিজ স্বার্থ সেবায় সুকরুণ আর্তনাদ করে মাঝামাঝি অবস্থান নিয়েছে। এদের একটি অংশ দুধের স্বাদ ঘোলে মিটায় আর বাকী অংশটি রূপ পরিবর্তনের আগেভাগে শুধু দিন গুণতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় ভাগটি যার যার যোগ্যতা মাফিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। একটি ভাগ এরশাদ শাহীর পতনের সময় যে গণ-আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ঘটেছিল তাতে সামিল হয় এবং উপযুক্ত পরিবেশে প্রকাশ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ সৃষ্টি করে।

নূতন প্রজন্মের সর্বাধিক কৃতিত্ব হচ্ছে---সমগ্র সমাজে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পেরেছে। তারপর দশকের পর দশক ধরে এই চেতনা প্রবল জোয়ারে এগিয়ে চলছে। এমনকি জাতীয় শক্তির স্ফুরণ ঘটাতেও এই চেতনার কাছে কোন বাঁধা প্রকৃত বাঁধা হয়ে থাকেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান সামরিক জান্তা গত বিশ বছরের অধিক সময় ধরে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে আসছে। এই জান্তার দাঁত খিচুনী, রক্তচক্ষু, ইলেকট্রিক শক, বুলেট বেয়নেটের পৈশাচিকতা তামাম দুনিয়ার ঈথার তরঙ্গে সর্বক্ষণ ভেসে চলেছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটেনি প্রস্তরীভূত পাহাড় ধ্বসে গিয়ে যেভাবে পাহাড়ী ঝর্ণার সৃষ্টি হয় অনেকটা সেই প্রাকৃতিক নিয়মে আরো এক নূতন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। সেই প্রজন্মের ছাত্র আন্দোলন আজ শুধু জুম্ম সমাজে নয়, শত্রুর শিবিরে অন্তরে, সমগ্র বাংলাদেশের সচেতন মহলে এমনকি বিশ্ব বিবেকের কাছে নিয়ত আলোচনার বিষয়বস্তু।

পাহাড়ী গণ পরিষদ ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ—প্রজন্মের এই উভয় সংগঠনই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতীক। তবে অতীতের চেয়ে নূতন ধারা অনেক সুন্দর, প্রেরণাময়ী ও তেজস্বী। তাই ছাত্র আন্দোলনই হচ্ছে এই আন্দোলনের প্রভাস্বর।

এই আন্দোলনের উত্থান বেশী দিনের নয় যার গতি আজো শুরু। এই আন্দোলন মারণাস্ত্রের ঝন ঝনানী দেখায় না, রকেট মর্টারের গর্জন হাঁকায় না। কিন্তু তবুও সেটি শত্রুর মনে বেশরম আশঙ্কা যেন ঘুমের মধ্যে চেপে বসা ক্যাট—যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সমগ্র যন্ত্রটা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ছাত্র ও যুবসমাজের বর্তমান সময়ের এই তৎপরতা বিদ্যমান সামরিক জান্তার কাছে অসহ্য—যেন চক্ষুশূল। ছাত্র ও যুব সমাজের অত্যন্ত আপন বক্তব্য হচ্ছে 'আমাদেরও কিছু বলার আছে।' বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদম্ভ উক্তি হচ্ছে 'আমরা আর ছোট্ট শিশুটি নই।' কথাটা সঠিক নয়, আরও সত্য হচ্ছে ছোট্ট শিশুর মত সহজ সরল ও সর্বজনপ্রিয় ব্যবহার ও তাদের নেই। আছে শুধু দাম্ভিকতা, আছে উদভ্রান্ত যৌবনের পাশবিক লালসা। তাই তাদের দুর্বলতা অনেক। অপর পক্ষে ছাত্র ও যুব সমাজ সশস্ত্র

লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়না— চালায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বলে সত্য কথা— প্রকাশ করে শত্রুর দুর্বলতা। সবচেয়ে বড়ো কথা আজকের এই প্রজন্ম শত্রুর সীমাহীন দুর্বলতাকে তুলে ধরার এক হৃদয় বিদারী সাহস অর্জন করেছে। তাদের এই সাহস উচ্চ-মণ্ডলীয় মশাগুলোর ঔদ্ধত প্রতিরোধের ক্ষমতার্জনের মতই আশ্চর্যজনক। তার সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে জাতিসত্তাকে ধ্বংস করার যাবতীয় উদ্ধত ও হীন কার্যকলাপের গর্ভেই তাদের জন্ম।

জুম্ম সমাজের বৈষয়িক জীবনে মূলতঃ কোন অগ্রগতি সাধিত হতে পারেনি। বরঞ্চ বলা যায় জুম্ম জনগণ বিগত উনিশ বছরের আন্দোলনে অনেক কিছুই হারিয়েছেন। সেই সাথে হারিয়েছেন ভয়ভীতিকেও। নদীর এক কূল ভাঙলে যেমন অন্য কূল গড়ে উঠে তেমনি হারানোর পরিবর্তে জুম্ম জনগণও যা লাভ করেছে তা হচ্ছে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি। তুলনা করলে দেখা যায়—অতীতে যুগে যে পুরোনো প্রজন্ম খাকী উর্দিপরা একটা পুলিশ কিংবা ফরেস্ট গার্ড দেখলেও যেখানে ভয়ে অসাড় হয়ে যেত সেখানে আজকের নূতন প্রজন্ম সশস্ত্র বাহিনীর শত অত্যাচার ও দানবীয় চেহারাকেও আর ভয় করে না। আজ আধুনিক মারণাস্ত্রের সম্মুখে ধুম্র কুণ্ডলীর মধ্যেও তারা সত্যকে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর।

নূতন প্রজন্মের দায়িত্ব

নূতন প্রজন্মের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছাত্র ও যুব আন্দোলন আজ সফলতার সাথে এগুচ্ছে। শত্রুর সবচাইতে স্পর্শকাতর দিকটি তারা খুঁজে পেয়েছে। তাদের আঘাতে শত্রুরা আজ যন্ত্রণা কাতর হয়ে পড়েছে। ছাত্র আন্দোলনের মুখপত্র 'রাডার' '৯২ সালের লোগাং এর উন্মত্ত পাশবিক গণহত্যা ও রাঙ্গা-মাটিতে হনুমানের ঘটানো লংকা কাণ্ড অত্যন্ত সফলভাবে তুলে ধরেছে। তাই সাম্রাজ্যবাদের জল্লাদ প্রহরীরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা আজ অত্যন্ত বন্য স্বভাবে বেয়াড়াভাবে প্রতি-শোধ পরায়ণ হয়ে উঠেছে। তাদের রোষাণ দৃষ্টিই অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে ছাত্রদের উপর। বাস্তবতঃ এভাবে শত্রুকে রাগিয়ে দিতে পারাটাই হচ্ছে ছাত্র আন্দোলনের সাফল্য।

কিন্তু নূতন প্রজন্মকে শুধু এখানেই দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। তাদের অধিকতরভাবে ঐক্যবদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে অপেক্ষাকৃত সংগ্রামী ও সক্রিয় হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। মহান ত্যাগের অধিকারী হয়ে শত্রুর দুর্বল জায়গায় পাশাপাশি জুম্ম জনগণের দুর্বলতাগুলোতে আঘাত করাও তাদের দায়িত্ব। জুম্ম জনগণের মধ্যে যাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতা ও পশ্চাদপদতা রয়েছে এবং যে সব বিষয় প্রগতিশীলতাকে বাধা দিচ্ছে সে সবের দুর্গেও কামান দাগতে হবে। যেহেতু সামন্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতিক্রিয়াশীলতা উভয়ই প্রগতির প্রতিবন্ধক সেই হেতু উভয় দুর্গে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে চুরমার করে দিতে হবে। এ কাজের সাফল্য অনি-বার্য। কারণ জুম্ম সমাজের ও বাংলাদেশের সচেতন মহলের কাছে এই দায়িত্ব ব্রতীরা অত্যন্ত প্রিয় প্রজন্ম হিসেবে চিহ্নিত। আন্দোলনকারী তরুণ শক্তির জন্য আরো একটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে—আন্দোলনের দুটো পদ্ধতি আছে—একটি নিয়মতান্ত্রিক অন্যটি অনিয়মতান্ত্রিক। একটা আন্দোলনের এই হচ্ছে দুটো দিক। এই দুটো দিকের মধ্যে অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনটাই হচ্ছে মুখ্য। যদিও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনটাও অপরিহার্য তথাপি নিশ্চিত ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে না উঠা পর্যন্ত তা মুখ্য হতে পারে না। অতীত ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে সত্তর দশকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে যেভাবে গলাটিপে ধরা হয়েছিল তেমনি আজকের সময়েও 'রাডার' 'স্যাটালাইট' বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, রাঙ্গামাটি ও মাইনী মিছিলে নগ্ন হামলা চালানো হয়েছে, লোগাং ঘটনার নির্লজ্জ রায় দেয়া হয়েছে—এই সব হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অশুভ ইঙ্গিত। কিন্তু এটুকুই সব নয়। যে কোন মুহূর্তে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দল বন্ধও করে দেয়া হতে পারে। তখন তরুণ নেতৃত্বের শক্তি সংরক্ষণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।

অথচ উদীয়মান তরুণ নেতৃত্বের একটা বিরাট অংশের মধ্যে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি অনীহা দেখা যাচ্ছে। তাই যদি হয় এই নেতৃত্ব এক বাহু বিশিষ্ট সেনাপতি হবে। যার পরি-ণতি হবে আজকের সহজবশ্য দুর্বল নেতৃত্বেরই অনুরূপ। অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে কাঠিন্য আছে, বৈপ্লবিকতা আছে কিন্তু আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য নিজেদের সংগ্রামী শক্তি সংরক্ষণের অধিকতর নিশ্চয়তা থাকে যা অনিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের থাকে না। এই জন্য একটাকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে অন্যটিকে অস্বীকার করাটা হচ্ছে আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা। অতএব নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে অনিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অন্ততঃ বর্তমান পর্যায়ে যারা অস্বীকার করে তাদের মধ্যে আন্দোলনের সঠিক উপলব্ধি গড়ে উঠেনি বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু যোগ্য উত্তরাধিকারী

হিসেবে উদীয়মান নেতৃত্বের কাছে কুর্দ্দ জনগণের আন্দোলন পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিই দাবী করে।

নূতন প্রজন্মের দুর্জয় চেতনার কৃতিত্ব

যে কোন রাজনৈতিক তত্ত্ব যদি সর্বসাধারণ একবার গ্রহণ করে থাকে তাহলে তা একটা বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়। আর সেই তাত্ত্বিক চেতনাকে ধ্বংস করার সাধ্য কারোর থাকে না। নূতন প্রজন্মের এই চেতনা ও কুর্দ্দ জনগণ সার্বিক ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। এই চেতনা অজেয়। তাই শত্রুর এক প্রচণ্ড আঘাতেও এই চেতনা থেকে তাদের বিচ্যুত করতে পারেনি। বরঞ্চ প্রতিবারের আঘাত এই চেতনাকে নূতনভাবে সচেতন করেছে, প্রাণ সঞ্চার করেছে এবং গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই এই চেতনার স্তরে স্তরে নূতন উদ্যমে গড়ে উঠেছে যোগ্য উত্তরাধিকারী। আর এই যোগ্য উত্তরাধিকারী গড়ে তোলাই হচ্ছে নূতন প্রজন্মের চেতনার কৃতিত্ব। সুতরাং কুর্দ্দ জাতির যেমনি ধ্বংস নেই তেমনি এই চেতনারও কোন মৃত্যু নেই।

শহীদের স্মরণে

শ্রী কিশোর

তা'দের অবদানে
গাহি মোরা বিজয় গান
দিই মোরা তাদের জীবনের জয়ধ্বনি।
আনন্দ বেদনায় ব্যথিত মরণে
স্মরি মোরা তাদের গৌরব কাহিনী॥
যাদের অবদানে জাতি লভিল গরিমা,
রচিল যারা জাতির ঐতিহ্য মহান
নয়নের জলে মোরা অর্ঘ রচিয়া—
স্মৃতির তর্পণে স্মরি তাদের মহান।
মনের মানসে
মোরা অঞ্জলি দানি—
"সুখী হও বন্ধুজন"
অনুরাগে সংগ্রামে যাচি মঙ্গলবাণী।
ধন্য জীবন তাদের—
অমিত গৌরব মহীয়ান,
তাদের স্মরণে—
গাহি মোরা তাদের জীবনের জয়গান॥

RELIGIOUS PERSECUTION AND ISLAMIZATION OF THE CHITTAGONG HILL TRACTS

—EMAIL

The Chittagong Hill Tracts (CHT) in Bangladesh, a land of more than 600,000 indigenous Jumma people of Chakma, Marma, Tripura, Murung, Chak, Bowm, Pankho, Lusai, Kheyang and Khumi is, now, on the verge of total engulfment by Islam persecuting Buddhism, Hinduism and Christianity of the Jumma people. BERNARD NIETSCHMAN (University of California, Berkeley) in his treaties 'INDONESIA, BANGLADESH ; Disguised Invasions of Indigenous Nations' rightly remarked :— 'Third world Colonialism has replaced European Colonialism as the principal global force that tries to subjugate indigenous peoples and their encient nations.' Alike many other Third World states Bangladesh government, too, in the garb of colonialism, pursued the policy of national subjugation destroying the indigenous Jumma people in the CHT. It waged an undeclared war in the name of territorial consolidation and national integrity against the Jumma people when they demanded regional autonomy with a legislature. They have been struggling for self-determination under the leadership of the JANA SAMHATI SAMITI (JSS) to safeguard their national existence, integrity of their motherland, history, culture, etc. for long twenty years. Bangladesh government deployed more than 70,000 military and para-military forces to thward the movement for self-determination of the Jumma people in the CHT. Under the government sponsorship "Transmigration programme" more than 500,000 Bengalee Muslims were given settlement rooting out the Jumma people from their ancestral lands. The 'Transmigration' is nothing but annexation by occupation. After the independence of Bangladesh gross human rights violations such as, unlawful killing, ethnocide, arrest, torture, rape, arson, religious persecution, conversion to Islam, eviction, etc. that carried out on the Jumma people have no parallel in the history of mankind in the world. One will wonder to see how Islam, which the Muslims claim as a religion of peace, is engulfing the region with lightning rapidity and dramatic swiftness persecuting other religious, culture, etc. under the policy of Bangladesh government with the Quaran in one hand and the sword on the other.

Buddhism, Hinduism and Christianity are three main religions variedly practise by the Jumma people in the CHT. The Chakma, Marma, Murung and Chak, who are Buddhists constitute more than 80% of total Jumma population in CHT. It is true that Buddhism has been persecuted by Bangladesh government by its army and Muslim infiltrators very rootlessly. Religious persecution in the CHT by Bangladesh government is well documented in the report of International CHT Commission and in the writings of many foreign visitors. Out of hunderds of religious persecutions only a few glaring examples are cited as under :—

PERSECUTINON ON BUDDHISM

1. The Barkalak Buddhist temple, Panchari Upazilla

On 16 August, 1972 the BDR of Dudukchara camp raided a number of villages including the **Barkalak Buddhist temple at 243, Chengi Mouza,** Panchari Upazilla when the victorious Mukti Fouj (Freedom Fighters) unleashed a reign of terror by indiscriminate killing, arrest, rape, arson, looting, etc.

throughout the CHT. Rev. Jnananda Bhikkhu, then 65 years of age, of the temple was severely beaten by rifle butts and broke his right hand. The perpetrators broke into pieces the image of Lord Buddha and ransacked the temple plundering a sum of sixteen thousands takas. Some young women, who went to worship the Buddha were raped in the temple. Then, the human rights situation seriously deteriorated in the region. A high powered delegation under the leadership of Manabendra Narayan Larma (MPA), Nakul Chandra Tripura (Tripura leader), Aung Sue Prue (Bomang Chief), Birendra Kishore Roaza (Ex. MLA), Ananta Behari Khisa (Educationist), Rupayan Dewan (Student leader) and others went to Dhaka to demand regional autonomy for the CHT. The delegation met the Home Minister Abdul Mannan and formally talked. They show him the wounded Buddhist monk with his hand bandaged. The Home Minister expressed 'sorry' only. He neither made arrangement for better treatment of the monk nor, any enquiry of the incident although the delegation demanded impartial judicial enquiry.

2. The Milan Shanti Buddhist temple, Pujgong, Panchari Upazilla

On 22 February, 1979 the Bangladesh army from Panchari raided Pujgong and burnt down the houses of the villagers, arrested, tortured and raped the innocent people brutally. They entered the Milan Shanti Buddhist temple and ransacked it. The head of the statue of Load Buddha was broken into pieces and played like football later. Rev. Aniruddha Bhikkhu of the Vihara was severely beaten and broke his right hand.

3. The Maischari Buddhist temple, Mahalchari Upazilla

On 25 March, 1980 the Bangladesh army from Maischari army camp and Muslim infiltrators combinedly launched an operation near the Maischari Buddhist temple villages. The infiltrated Muslims slaughtered a cow in the temple premises and smeared cow blood on the image of Lord Buddha. They looted all properties of the temple and Bhikkhus were beaten up.

4. Nine Buddhist temples in the Kalampati Massacre

Kalampati is the example of the most horrible Jumma blood bath by the Bangladesh army and Muslim infiltrators in the Kalampati Union on 25, March, 1980. In this unprovoked brutal ethnocide 300 innocent Jumma people were killed on the spot, 30 women were abducted and taken into military camp and raped later. Nine Buddhist temples were destroyed and twenty monks including Rev. Panna Chara Bhikkhu of Roaza Para Buddha Vihara and Rev. Uchandra Giriya Bhikkhu of Kashkhali Buddha Vihara were severely beaten up and many of them were hospitalised at Rangamati hospital with serious wounds (Ref.—IWGIA Document 51, at page 152). In this massacre the villagers and a number of Buddhist temples of Mitingachari, Baskhali, Balimara, Kachukhali, Rangipara, Kaokhali, Maiganachari, Kaskhali, Baradalu, Chotodalu, Poradom and Ultapara villages were all burnt down killing and wounding a large number of people.

5. The Nalkata temple, Panchari Upazilla

In 1986, the Nalkata Buddhist temple was completely destroyed by the Bangadesh army and an army camp was set up on the ruins of the temple.

6. The Takurjyama Kalak Buddha Vihara, Longudu Upazilla

On 27 December, 1979 the army and infiltrated Muslims ransacked and looted the Takurjyama Kalak Buddha Vihara. The images of the Buddha were broken and thrown on the river. Rev. Ajara Bhikkhu and Rev. Bannitananda Bhikkhu were hacked to death and their dead bodies were thrown on the Karnaphuli Lake.

7. The Kattali Buddhist temple, Longudu Upazilla

On 10 March, 1984 the army from Longudu ransacked and plundered all wealth of the temple. They slaughtered a cow in the vihara and desecreted the temple sprinkling cow blood on the Buddha.

8. The Monorama Buddhist temple, Baghaichari Upazilla

On 8 May, 1986 a group of army, VDP and Muslim infiltrators in a combined operation encircled the temple. The perpetrators wounded Rev. Pragyaneshwar Bhikkhu by rifle butts. He was stripped off and kicked like a football and hospitalised at Rangamati. All riches of the temple were looted away.

9. The Lalchari Buddha Vihara, Ramgarh

In 1986, Rev.Nengdia Bhikkhu of Lalchari Buddha Vihara was killed by a gang of Muslim infiltrators, who looted the temple and ablazed it later.

10. Destruction of 54 Buddhist temples in nine upazillas in eight months

The most horrible and brutal Panchari-Dighinala-Matiranga-Khagrachari ethnocide was perpetrated combinedly by army, ansar, VDPs and Muslim infiltrators in May, 1986 in which, hundreds of the Jumma people were killed, tortured, raped and thousands of houses were burnt down and looted. As a result, more than 60,000 Jumma people including 66 Buddhist monks fled to Tripura, India. In the massacre Buddhist temples were not spared. It was found that from May, 1986 to December, 1986 fifty four Buddhist temples either wholly or, partially were destroyed in the Upazillas of Panchari, Dighinala, Khagrachari, Matiranga, Ramgarh, Baghaichari, Rangamati, Naniachar and Kaokhali alone.

The International CHT Commission visited the CHT in December, 1990 to study the human rights violations in the CHT. It visited the Boalkhali temple and orphanage, Dhalaima temple and Baghaichari temple, Dighinala, the Tintilla temple, Longudu, the Pujgong Mukh temple, Panchari and many other religious places in the region. It found many examples of religious persecutions. In its report at one point it was remarked :— "The destruction of the Boalkhali orphanage has been well decumented and came to the international prominence when 72 children, who survived the attack were taken into temporary care in France during 1988. On December 15th the Commission visited lhe area of Boalkhli. People confirmed that the orphanage and temple had been destroyed by settlers and houses burnt in 1986." On 15 December, 1990 the Commission searched for the remains of Dhalima Buddhist temple which was destroyed in 1986. It found that the temple now consists of few bricks and some small cemented foundations. Regarding the Baghaichari Mukh Buddhist temple, the Commission remarked :— "The temple itself has no walls or roof. A framework of poles remain enclosing the image of the Buddha. One ear of the Buddha has been destroyed, the paint has peeled and it is badly marked. A coconut and candle grease show that worship continue there. A broken stele lies nearby." The Commission visited the Milan Shanti Buddha Vihara, Pujgong on 17 December, and found that the Vihara stands at the top of a steep hill. The front of the adobe temple has been completely destroyed and inside on altar stand three headless Buddhas. Eye witness accounts left no doubt in the Commission's view that the army had perpetrated the deed. As regards to Tintilla temple the Commission views that although the concrete structure and tower remain standing, the interior has baen severely damaged by fire. The image of the

Buddha showed signs of being slashed with daos and one ear lobe had been cut off. Another smaller figurine of the Buddha was completely burnt. Amnesty International's findings on the Longudu massacre note that armed Bengalis and the VDPs were directly involved in the destruction of Tintilla Buddhist temple.

PERSECUTION ON HINDUISM

The Tripuras believe in Hinduism. The Hinduism has been persecuted also. In 1986, twenty two Kali Mandirs, Hari Mandirs and Baishnab Mandirs were burnt down by the army and the infiltrators, excluding the destruction caused on the Hinduism in different years after independence of Bangladesh. Some destroyed temples were the Kali Mandir of Madhu Karbari Para, Pujgong, the Kali Mandir of Manindra Tripura Kalanal, the Kali Mandir of Mihir Ranjan Tripura, Pujgong, the Kali Mandir of Madhu Kumar Para, Panchari, the Hari Mandir of Keshab Chandra Tripura Para, Khagrachari, the Jagannath Mandir of Bara Merung, 30, Bara Merung Mouza, the Baishnab Mandir of Ram Babu Dheba, the Kali Mandir of Purna Kumar Tripura, the Kali Mandir of Sujan Kumar Tripura, The Baishnab Mandir of Banshi Das Tripura Para of Matiranga Upazilla and so on.

PERSECUTION ON CHRISTIANITY

There is no end to religious persecution in the CHT. The Christianity has been persecuted to a great deal although the Christians are microsepic in number in the CHT. Some instances on persecution on the Christianity are detailed as under :

1) The Karolyachari Church, South Atarakchara, Longudu

There was a Baptist church and a Leprosy Treatment Centre at Karolyachari village maintained by Dr. Flower from Chandraghona Arthington Hospital. The Bangladesh army, 19 EBR, from Longudu in an operation burnt down the church and the Leprosy Centre on 17 November, 1979.

2. The North Atarakchara church, Longudu

There were 18 Baptist christian families with 190 population at North Atarakchara village. The army, 19 EBR, from Longudu in an operation shot death Subash Chandra Chakma, S/o. Anitya Kumar Chakma and Naba Kumar Chakma and the church and houses of the village were burnt to ashes.

3. The Jatramura Church, Longudu

The Muslim infiltrators from Longudu backed by the army burnt down the Jatramura village and the church on 17 November, 1979.

4. The churches of Madhu, Bandarban

The Tripuras of Madhu in Bandarban are Roman Catholics. In the winter, in 1979, the harmy from Madhu rounded up the christians Tripura villages during prayer. They arrested and tortured the villagers. Pastor Andrio and others were severely beaten. Lastly, the churches and villages around Madhu were burnt down.

5. The churches of Alikadam area, Lama

On 25 December, 1982 a group of army from Alikadam cantonment launched an operation on the Christian Tripuras. They burnt down all churches and villages of Sona Chandra Tripura Para, Kasta Ram Tripura Para, Jitraha Tripura Para and Letong Tripura Para. The helpless villagers were arrested and tortured mercilessly.

6. The Betchari christian para, Khagrachari

The destruction of a religious building took place on 31 October, 1990 in Betchari christian para, Khagra-

chari, where there is a church built with funds from Canadian Baptists. Several houses and the Christian churches were destroyed on that day. The CHT Commission on visiting the church found that the walls had been completely pulled down and the interior had been ransacked. Eye-witnesses confirmed the Commission that the destruction of the church was done by the army and Muslim infiltrators.

Prevention from worship to the Jumma people is another form of religious persecution. Worship is prevented by the military in three ways : Desecretion, prohibition of performing religious ceremonies and controlling devoteers travelling to sacred shrines. Sacrilege of religious temples by the army is a day-to-day event in the CHT. Entering the Buddhist temple on shoe-legged is a religious taboo. The army intentionally enter the temple on shoe-legged and variously sacrilege the religious temples. The army deter the Jummas from practising religion through structural violance. In this connection one example is cited :— On 19 October, 1990 KATINA CHIBAR DANA festival was arranged at Rangamati. The Jumma people from Kaptai went to the ceremony. On the way, 26 people were blockaded by a group of army of Baradam camp. Ten men were separated from fourteen girls and two women were beaten up and forcibly made dancing naked. The women were gang raped. Besides, the Jumma people even require prior permission from the army before performing any religious or, social function. Chitmaram is the most sacred shrine of Buddhism in the CHT. Hundreds of worshippers from in and out of the CHT would go to Chitmaram each year. But nowadays because of constant checks by the military it become very difficult for the Buddhists to reach Chitmaram temple. They require permission from the army to go there. The CHT Commission visited Chitmaram and confirmed the fact.

Forced conversion to Islam is the most brazen policy of the government for Islamizing the Jumma people. Till now a number of Jumma people were converted to Islam forcibly. It was found that the victims at one time were fabricately entangled with problems collaborating with the Shanti Bahini, at other time, they were allured with money and other facilities or, the were kidnapped and abducted. Generally, women were abducted and compelled to marry Muslims and embrace Islam.

In the context of converting the Jumma people to Islam one glaring example is cited. Col. Mahub Hassan, Regional Commander, Dighinala on pressure and allurement with money intrigued six Chakmas to convert to Islam on 25 November, 1992 and another Chakma on 30 November, 1992. The converted Chakmas were sworn in by Moulvi Hafej Mohammed Abul Basar and Mohammed Mashud, T. N. O. Dighinala. The names and addresses of the converted Chakmas are given as under :—

Sl. No.	Name	Islamic name
1.	Baliranjan Chakma (27), S/o. Surendra Lal Chakma, Vill— Banchara, P. S. Dighinala, Khagrachari ;	Md. Shajed Ali Sheikh
2.	Swarma Chakma (24), W/o. Bali Ranjan Chakma, add. do ;	Fatema Khatun

Sl. No.	Name	Islamic name
3.	Miss Rashiq Guri Chakma, D/o. Bali Ranjan Chakma, add.—do ;	Masammat Roshan Ara Begum
4.	Miss Milabo Chakma, D/o. Bali Ranjan Chakma, add.—do ;	Mosammat Taslima Khatun
5.	Dighi Kumar Chakma, S/o. Bali Ranjan Chakma, add.—do ;	Mohammed Abdullah
6.	Sukhi Chakma, D/o. Bali Ranjan Chakma, add.—do ;	Mosammat Sakhina Khatun
7.	Shankar Chakma (25), S/o Amar Kanti Chakma, Vill.—Baradam, P.S. Dighinala, Khagrachari District.	Abdul Shahid

Hla Kya Mong, class eight, S/o. Mong Hashing Marma, Vill—Noapara, Alikadam, Islamic name Md. Hassan and U-Hla Thowai, S/o. Aung Shing, add.-do, Islamic name Md. Hossain in the above were forcibly converted to Islam by Dr. Moin Uddin Ahmed Khan professor of Islamic history and culture, Chittagong University on 3 January, 1990 from the clutches of Baitus Sharaf Madrasha, CTG. The above two persons first came to Chittagong and lossing way stepped into the clutches of Baitus Sharaf Madrasha.

Population and Islamization of CHT— 1941-1993

Year	POPULATION							Islamization	
	Total population	Jumma			Non-Jumma			Mosque	Madrasha
		Number	Rate of growth	Percentage	Number	Rate of growth	Percentage		
1941=	2,47,053	2,39,783	—	97·1	7,270	—	2·9	2	—
1951=	2,87,688	2,61,538	9·08	91	26,150	260	9	10	—
1961=	3,85,079	2 92,113	11·69	76	92,966	256	24	40	2
1974=	5,08,199	3,92,199	34·26	77	1,16,000 *	24·78	23	200	20
1981=	7,51,692	4,41,774	12·64	59	3,09,918	167·17	41	592	35

Source= Govt. Census

Al-Rabita is the Main Islamic missionary organisation working in the CHT to convert the Jumma people to Islam. Funded by Saudi Arabia and Kuwait, this organisation has been working since 1980. It has a main office in Dhaka and office in Rangamati and Longudu where it has a hospital also. In Alikadam, Al Rabeta has an Islamic missionary centre. The army and Al Rabeta converted a number of Jumma people to Islam. The Jamat-i-Islam has been found very much active in the CHT which, organises Al Rabeta mainly. Mosques and madrashas throughout the CHT continue to build actively. According to the source of the CHT District statistics there were 592 mosques and 37 madrashas in the CHT in 1983. The CHT Commission in its report at one point remarked :—"Loudly amplified calls to prayer frequently punctuated the work of the Commission hill peoples' villages close to Bengali settlement."

The Jumma women are forced to put on Muslim 'yashmak'. In a publication in the 'Satelite' 6 October, 1992 under the caption—"The Jumma students are forced to put on 'yashmak'" it was stated that Md. Qazi Zia-Ul Hoque, a fanatic teacher of the Matiranga Pilot High School, Khagrachai District punishes the Jumma girls when they come to the school without putting on 'Yasmak'. He compels them to put on yashmak. It is a type of religious persecution on the Jumma people. The Jumma people are not intolerant of Islam. But, they vehemenly oppose and condemn Islamizing the CHT on persecution of their religion, culture and above all destroying their national existence through the surreptitious policy of the government.

The cultural world of the Jumma people is colourful in which, different aspects of ethnic life are interconnected. Their unique culture is aesthetically pleasant that maintains spiritual and social equilibrium. Unfortunately, their culture such as, song, dance, dress, etc. are being debased by the army with the social interactions with the infiltrated Muslims. It was found that cultural show of the Jumma people displayed to the visitor are not in conformity with the Jumma culture but according to the taste of the military authority. The CHT Commission also observed this deviation comparing the cultural shows shown to them in Tripura by the Jumma refugees and the cultural shows of the Jumma people shown by the military in the CHT. It is mainly done to bring the Jumma people into the national main stream of Muslim-based culture.

The nefarious policy of reducing the CHT into a Muslim region changing the demographic patterns of the area has been being followed since Pakistan time violating the CHT Regulation—1900 (1 of 1900), which restricted the entry and settlement of land to the outsiders. After the birth of Bangladesh as independent state Bangladesh government, too, followed the policy of Islamizing the CHT more brazenly. It is noted that before the creation of Pakistan the ratio of Muslim population in the CHT was 0.50% only. In the census of 1951 the Muslim population was 18,670 and in 1961 census the figure stood 45,322. There was no census in the country in 1971 because of the war of independence of Bangladesh. In 1981 census the number of Muslim population in the CHT was 3,13,188 (Source :—Census of B. B. S.), which means that the increase of Muslim population in the CHT was geometrical progression. It is true that in the eighties there was flood of Muslim infiltrators in the CHT brought by the government under military surveillance from other parts of Bangladesh. It is estimated that the present number of Muslim population in the region will be not less than 6000,000 Out of 28 police stations in the CHT, in Bandar-

ban, Ruma, Thanchi, Alikadam, Lama, Nakhyangchari, Chandraghona, Kaptai, Rajastali, Longudu, Baghaichari, Romgarh, Matranga andManikchari polce stations the Muslims preponderate and who, totally grabbed the lands of the Jumma people outreoting them from their ancestral lands. In many other police stations the ratio of Muslims and Jumma people is about equal. The clandestine in.flow of Muslim infiltration in the CHT continue to like place still now although, Bangaladesh Governmcat blatantly denies it. The CHT commission in its report remarked :— "The Bangalis in the CHT already outnumber the Jumma people in Bandarban District and Rangamati and Khagrachari Districts the ratio may be equal ; This means that the army is enforcing a system of Bengali culture ann admistration onto the hill people."

The aim of Bangaladesh Government for Islamizing the CHT is complete. Unless, the ages old problem of the CHT is solved through poiltical and constitutional means guaranteeing the land right to the Jumma people, the rights to determine their own fate and the infiltrated Muslims are not taken back to their home Districts the national existence of the Jumma people shall perish from the Earth, soon.

সংবাদ

জনসংহতি সমিতির সাথে সরকারের একাদশতম বৈঠক

খাগড়াছড়ি। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির একাদশতম (বর্তমান সরকারের সাথে ৫ম) বৈঠক খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে সরকার ও জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন যথাক্রমে যোগাযোগমন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির আহবায়ক কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ ও জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু)।

এদিন যথারীতি সকাল ১০:৩০ মিনিটে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দকে দুদুকছড়া থেকে হেলিকপ্টার যোগে খাগড়াছড়িতে আনা হয়। যোগাযোগ কমিটির সদস্যবৃন্দ সমিতির নেতৃবৃন্দকে সার্কিট হাউজে অভ্যর্থনা জানান।

সকাল ১১:১৫ মিঃ যথারীতি চতুর্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার শুরুতেই সরকারী কমিটির প্রধান স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন। এরপর জনসংহতি সমিতির প্রধান একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে ৪র্থ বৈঠকের আরোপিত দু'টি শর্ত পালন না করার জন্য অভিযোগ করেন। তাঁর এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনাব অলি আহম্মদ ২২টি নুতন ক্যাম্প প্রত্যাহার ও বন্দীদের অচিরেই মুক্তি প্রদানের কথা উল্লেখ করেন। এরপরই সংশোধিত ৫ দফার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য পেশ করা হয়। মূলতঃ এটাই ছিল এ বৈঠকের আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। ৯ পৃষ্ঠা এক প্রত্যুত্তর দলিলে ৫ দফার প্রতিটি দফা ও উপদফা উল্লেখ পূর্বক প্রত্যেক বিষয়ে সরকারী বক্তব্য সন্নিবেশিত রয়েছে। সরকারী এ বক্তব্যে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৮৯ সালের তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন ও ২২টি বিষয়ের ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবীকে পূরণ করা হয়েছে। তবে তিনটি পার্বত্য জেলাকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করা বাস্তব সম্মত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি অধিকারের প্রশ্নেও জেলা পরিষদকে ক্ষমতা প্রদানের কথা উল্লেখ করা হয়। সরকারী বক্তব্যে অনুপ্রবেশকারীদের বহিস্কারকে সংবিধান পরিপন্থী ও পর্যায়ক্রমে সেনা ক্যাম্পগুলি প্রত্যাহার করার কথা বলা হয়।

সরকারী পক্ষের প্রদত্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সমিতির প্রধান তাঁর আলোচনায় বলেন, এটা সমিতির গ্রহণযোগ্য নয়। সরকারী প্রদত্ত এই বক্তব্য চূড়ান্ত হলে সমিতির আর কোন কিছু বলার নেই। জনসংহতি সমিতির প্রধানের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জনাব অলি আহম্মদ বলেন, আপাততঃ চূড়ান্ত, তবে আলোচনা সাপেক্ষ। এরপর জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব মোস্তাক আহম্মদ, জনাব শাহজাহান চৌধুরী, শ্রী কল্প রঞ্জন চাকমা সমিতির নেতৃবৃন্দকে আরো যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি ও আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানান।

বৈঠকের শেষ পর্যায়ে সরকারী প্রদত্ত বক্তব্য চূড়ান্ত নয়, আলোচনা সাপেক্ষ সরকার পক্ষের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সমিতির নেতৃবৃন্দ ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে সম্মত হন। বৈঠকে আরো স্থির হয় যে, সরকারী প্রত্যুত্তরে সমিতির নেতৃবৃন্দ লিখিতভাবে দলীয় প্রতিক্রিয়া জানাবে ও নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ৪র্থ বৈঠকের শর্তাবলী অনুসারে বন্দীদের মুক্তি প্রদান ও ২৪টি নূতন ক্যাম্প প্রত্যাহার করতে সরকারী পক্ষ রাজী হন।

বিকাল ৪টায় বৈঠকের পরিসমাপ্তির পর উভয় পক্ষের নেতৃদ্বয় এক সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে নেতাদ্বয় আরো একমাসের যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি, পরবর্তী বৈঠকে বসার মতৈক্য ও সমস্যার সমাধানে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সমিতির প্রধান সন্তু লারমা আরো বলেন যে, সরকারের প্রদত্ত মতামত জনসংহতি সমিতির গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, সাংবাদিক, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সরকারী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ ও জনসংহতি সমিতির ৫ জন নেতা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

সাবেক জেলা প্রশাসকের স্ত্রীর নামে জুম্ম জমি বন্দোবস্তি

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শনকারী জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিদের পরিদর্শনকালে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ভূমি বন্দোবস্তি ও বেদখলের এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারীদের নিকট জনৈক জয়ন্ত বিকাশ দেওয়ান পিতা মৃত রমেশ চন্দ্র দেওয়ান এর লিখিত অভিযোগে জানা যায় যে, দরখাস্তকারী নামীয় ১৬৫ নং বাঙ্গালকাঠী মৌজার খতিয়ান নং ৯১, হোল্ডিং নং-২০১৮ এর ২.২৭ একর দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি হ'তে ১০ শতক জমি খাস করে খাগড়াছড়ি জেলার প্রাক্তণ জেলা প্রশাসক (ডিসি), খোরশেদ আনসার খানের স্ত্রী মিসেস রাফিদা খানম, পিতা-মৃত আব্দুর রউফ এর নামে বন্দোবস্তি (বন্দোবস্তি মামলা নং- ০১/৮৭-৮৮, আই ভি নং ১২৫/৮৭) দেয়া হয়েছে। দরখাস্তে আরো উল্লেখ করা হয় যে, দরখাস্তকারী ১৯৮৬-১৯৯১ পর্যন্ত ভারতের ত্রিপুরায় শরণার্থী শিবিরে অবস্থানকালে ১৯৮৭ সালে এই বন্দোবস্তি দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, বন্দোবস্তি প্রাপ্তা মিসেস রাফিদা খানম প্রতারণাপূর্বক স্বামীর নাম উল্লেখ না করে পিতার নাম উল্লেখ করেন। বলা বাহুল্য যে, এভাবে শতশত একর জুম্ম জমি জালিয়াতী ও ভূঁয়া দলিলের মাধ্যমে বেদখল করা হয়েছে। স্বয়ং জেলা প্রশাসক পর্যন্ত এরূপ প্রতারণা ও জাল দলিলের মাধ্যমে ভূমি বেদখলের এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

সরকারী উদ্যোগে বেআইনী অনুপ্রবেশ

মুসলমান বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসন বন্ধ রাখার কথা সরকারী ভাবে বলা হলেও অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে সরকারী উদ্যোগে এখনো অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন চলছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, আগস্ট মাসের ১ম সপ্তাহে ৬০ পরিবার মুসলমান বাঙালীকে গোপনে বান্দরবানে নিয়ে আসা হয় এবং অস্থায়ীভাবে বান্দারবান মডেল প্রাইমারী স্কুলে আশ্রয় দেয়া হয়। পরে এসব পরিবারগুলিকে বান্দরবানের বিভিন্ন থানায় পাঠানো হয়। সরকার কর্তৃক অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে এই অনুপ্রবেশ ঘটানো হলেও নবাগত অনুপ্রবেশকারীরা কাজের সন্ধানে ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে অন্যান্য পাড়ায় গেলে এ তথ্য ফাঁস হয়ে যায়।

অমুসলিম ও জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম প্রধান অঞ্চলে পরিণত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ থেকে এযাবৎ চার লক্ষাধিক মুসলমান বাঙালীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী উদ্যোগে পুনর্বাসন করা হয়। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েক হাজার মুসলমান বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করেছে। বান্দরবান জেলায় আজ অনুপ্রবেশকারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ৬০% ভাগ। বলা বাহুল্য, এই অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদ এই অনুপ্রবেশ বন্ধ ও পুনর্বাসিতদের বহিস্কারের জোর দাবী জানিয়ে আসছে। বস্তুতঃ এরূপ অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসন পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য বাংলাদেশ ও জনসংহতি সমিতির আলোচনার প্রক্রিয়া ব্যাহত করবে।

বান্দরবানে চাকুরী ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা থেকে উপজাতীয়রা বঞ্চিত

শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী ক্ষেত্রে নিয়োগের নীতি অনুসারে পার্বত্যাঞ্চলের তিন জেলার সংরক্ষিত আসন পূরণের অন্তরালে দীর্ঘদিন ধরে দুর্নীতি ও প্রতারণা অব্যাহত থাকায় প্রকৃত পার্বত্যবাসী শিক্ষিত বেকার চাকুরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

দেশের যে কোন নিয়োগ ঘোষণার ক্ষেত্রে সাধারণ নির্বাচনী প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার কৌশল হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলের

বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তি কোন না কোন ব্যক্তি ইউনিয়নের নাগরিক সনদপত্র সংগ্রহ করে পার্বত্য এলাকার ভুয়া বাসিন্দা সেজে কোটা প্রথায় সুযোগ গ্রহণ করে।

গত ছয় মাসের পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট পরিসংখ্যানে শতকরা ৬০ ভাগ লোকের কোন প্রকার সঠিক ঠিকানা খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে বিশেষ শাখা পরবর্তীতে এদের ব্যাপারে কি রিপোর্ট প্রেরণ করা হয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি।

শুধু চাকুরী নিয়োগ ক্ষেত্রে নয়, ব্যবসা বানিজ্যের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে অনেকেই পার্বত্য এলাকার ভুয়া বাসিন্দা সেজে কোটি কোটি টাকার লাইসেন্স পারমিটের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি পুলিশ বিভাগে পি এস আই পদে সাতকানিয়া নিবাসী শ্যামল মিত্র বড়ুয়া বান্দরবানের দুর্গম থানা রোয়াংছড়ির ৩৩৯ নং মেক্ষং মৌজার ওয়েগ্যা-পাড়ার মিথ্যা ঠিকানা দিয়ে স্থানীয় কোটা ভিত্তিক নিয়োগ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে তার দেয়া মোতাবেক পুলিশ ভেরিফিকেশনে আসলে কর্তৃপক্ষ তার ঠিকানার কোন হদিশ পায়নি। আলেক্ষং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তার এলাকার ভোটার তালিকা ও মৌজার ভূমি মালিকানা তৌজীসহ সকল প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও খবরাখবর নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ঐ নামে তার এলাকায় কোন বাসিন্দা নেই বলে জানিয়েছেন।

সম্প্রতি বান্দরবান জেলার প্রধান ডাকঘরে নূতন নিয়োগ প্রাপ্ত জনৈক কর্মচারী মানি অর্ডারের টাকা আত্মসাৎ করার ঘটনা প্রকাশের সাথে সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মগোপন করেছে এ পর্যায়ে বিভাগীয় তদন্তের জন্য অভিযুক্ত দেয়া ঠিকানা মোতাবেক খবর নিতে গিয়ে জানা যায় যে, বান্দরবান ছিদ্দিকনগর এলাকায় তার কোন ঠিকানা নেই।

ইতিপূর্বেও সরকার শিক্ষা ক্ষেতে শিক্ষক শূন্য পদ পূরণে ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করেছে। পার্বত্য কোটার প্রকৃত পক্ষে এলাকার বাসিন্দা নয় এমন লোক কোটা ভিত্তিক নিয়োগ লাভ করেছে। একই সাথে এলাকার শিক্ষিত বেকার বাসিন্দারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। (সৌজন্যে-দৈনিক পূর্বকোণ, চট্টগ্রাম, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)।

জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ৫ জন ভারতীয় উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাসহ ১৯ জন জুম্ম শরণার্থী নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর শুরু করেন। জুম্ম শরণার্থী কল্যান সমিতির সভাপতি প্রাক্তণ সাংসদ ও প্রেসিডেন্টের উপজাতি বিষয়ক উপদেষ্টা উপেন্দ্র লাল চাকমা সফরকারী শরণার্থী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

ঐদিন সকালে শরণার্থী নেতৃবৃন্দ ত্রিপুরার সাব্রুম থেকে নৌকা যোগে ফেনী নদী পার হয়ে রামগড়ে পৌঁছলে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদেরকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা দেয়া হয়। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সরকারী কমিটির সদস্য ও সাংসদ রাশেদ খান মেনন, মোস্তাক আহম্মেদ, রুপ রঞ্জন চাকমা প্রমুখ এই অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। রামগড় সার্কিট হাউজে ভারতীয় দলের উপস্থিতিতে শরণার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে শরণার্থী পুনর্বাসন কমিটির এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনায় বাংলাদেশ, ভারত ও জুম্ম শরণার্থী প্রতিটি পক্ষ থেকে শরণার্থী সমস্যার সমাধানের আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। বাংলাদেশ শরণার্থী পুনর্বাসন কমিটির পক্ষ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য জুম্ম শরণার্থীদের প্রতি আহবান করা হয়। এবং পূর্ব ঘোষিত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক সাহায্য দেয়ার কথা বলা হয়। জুম্ম শরণার্থী দলের প্রধান উপেন্দ্র লাল চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে এই শরণার্থী সমস্যার সমাধান সম্ভব। যেহেতু এ সমস্যাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে উদ্ভূত। তিনি আরো বলেন—আমরা প্রত্যাবর্তনে সব সময় উদগ্রীব। আমাদের ৬ের দফা দাবীনামা পূরণ হলে ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলে আমরা অবশ্যই ফিরে আসবো। ভারতীয় প্রতিনিধিদল এই শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ও সমস্যার সমাধান কামনা করেন।

পরিদর্শনকারী দলটি ঐদিনে মাটিরাঙ্গা হয়ে গুইমারা এলাকা পরিদর্শন করে বিকালে খাগড়াছড়ি পৌঁছেন। পরিদর্শনের দ্বিতীয় দিনে দিঘীনালা থানার মেরুং-এলাকা, কবাখালী, বোয়ালখালী, জারাবনিয়া, বড়াদম বাবুছড়া এলাকার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ গ্রাম, বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শন ও

স্থানীয় জুম্মদের বিভিন্ন অভিযোগ পত্রগ্রহণ করেন। এদিনের সকালে দিঘীনালার কাছাকাছি জামতলা পৌঁছলে স্থানীয় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সদস্যরা পরিদর্শনকারীদের সাথে সাক্ষাত করতে স্থানীয় জুম্মদেরকে বাধাদানের অভিযোগ করে। এতে পরিদর্শনকারী নেতৃবৃন্দ খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেন। উপেন্দ্র লাল চাকমা এই বাধাদানের জন্য চরম প্রতিবাদ জানান। এদিন বিকালে পরিদর্শনকারীরা খাগড়াছড়িতে ফিরে আসেন। পরদিন খাগড়াছড়ি ও পানছড়ি থানার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করা হয়। ১৯৯২ এ সংঘটিত লোগাং হত্যাকাণ্ডের স্থলটি প্রতিনিধিরা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনের শেষ দিনে প্রতিনিধিরা রাঙ্গামাটি গমন করেন। এদিন রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউসে প্রতিনিধিবৃন্দকে এক সম্বর্ধনা দেয়া হয়। এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে স্থানীয় জুম্ম নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। উপেন্দ্র লাল চাকমা এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বলেন, জুম্ম শরনার্থী সমস্যা কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। এটা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে উদ্ভূত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া শরণার্থী সমস্যার সুরাহা হবে না। তিনি আরো বলেন—১৯৮৬ সালে বিভিন্ন হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, ও অগ্নিসংযোগের কারণে আমরা শরণার্থী হয়েছি। আমরা সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবী করেছি। এসব হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচার করে দোষীদের শাস্তি দিন। তাহলে শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে আসতে আশ্বস্থ হবে। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে তিনি বলেন—শিবিরের জনসাধারণ ও ও নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবো। আমরা প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আশান্বিত ও নয় আশাহতও নয়। এর পর প্রতিনিধিরা বন বিহারে গমন করেন ও পূজা ক্রিয়া সম্পাদন করে খাগড়াছড়ি ফিরে আসেন। পরদিন শরণার্থী নেতৃবৃন্দ রামগড় হয়ে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন।

উল্লেখ্য, এই ৪দিন পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিরা বিভিন্ন শ্রেণীর স্থানীয় জুম্মদের লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করেন। এসব অভিযোগের মধ্যে ভূমি বেদখল, হয়রানী, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি বিষয় রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্মুখে এসব অভিযোগপত্র গ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনকালে ভারতীয় কর্মকর্তারা শরনার্থী নেতৃবৃন্দের সাথে সব সময় অবস্থান করেন এবং বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ সম্বর্ধনা ও আন্তরিকতায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

জুম্ম শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অস্বীকৃতি

ভারত সরকারের কাছে পেশকৃত রিপোর্টে জুম্ম শরণার্থী বৃন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে পুনরায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। ৩১০ অক্টোবর এ ত্রিপুরার রাজ্যপাল রমেশ ভাণ্ডারীর নিকট পেশকৃত ৪০ পৃষ্ঠার এক রিপোর্টে এই অস্বীকৃতির কথা জানানো হয়।

এই রিপোর্টে বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম শরণার্থী বাস্তুদের জমি এখনো অনুপ্রবেশকারী ও সেনাবাহিনীর বেদখলে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসনই এই ভূমি বেদখলের সাথে জড়িত রয়েছে। এই রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো শত শত সেনাক্যাম্প, চেক পোস্ট ও পেট্রোল পোস্ট রয়েছে এবং পূর্ণ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। নারী ধর্ষণ, অপহরণ, ধর্মীয় পরিহানী ও ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর এখনো ঘটছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে জুম্ম শরনার্থী সমস্যাটি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা থেকে উদ্ভূত। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ব্যতীত এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। গত এক বছর ধরে বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনা চললেও এর কোন অগ্রগতি হয় নি। এতে বাংলাদেশের সমস্যার সমাধানের অসদিচ্ছাই পরিলক্ষিত হচ্ছে।

রিপোর্টের শেষ পর্যায়ে বলা হয়, আমরা মনে করি পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি একেবারে স্বাভাবিক নয় এবং জুম্ম শরণার্থীদের ফেরত পাঠানোর পক্ষেও একেবারে সহায়ক নয়। এতে আরো বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সহায়ক ও ১৩ দফা দাবীনামা পূরণ হলে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের তত্ত্বাবধানেই জুম্ম শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

বান্দরবানে ১২টি বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

সম্প্রতি শিক্ষকের অভাবের অজুহাতে সরকার বান্দরবান জেলায় ৩টি থানায় ১২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছে। এতে উক্ত বিদ্যালয়সমূহের দু'হাজার জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সরকারের এই শিক্ষা সঙ্কোচনমূলক ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধের প্রতিবাদে শতশত জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী গত ২৫শে আগষ্ট বান্দরবান জেলা সদরে এক বিক্ষোভ মিছিল ও জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয় ঘেরাও করে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদও ঢাকায় ২২শে আগস্টে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে এ বিষয়টি উত্থাপন করেছে।

সরকার যখন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য নিশ্চিত করার ঘোষণা দিয়েছে সেই মুহূর্তে এই বিদ্যা সমূহের বন্ধ ঘোষণা একটি ষড়যন্ত্র। এটা জুম্ম জনগ শিক্ষা সংকোচন নীতির এক প্রাথমিক পদক্ষেপ। এছাড়া বান বান জেলা পরিষদের আওতাধীন এই প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধের জন্য বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অকার্যকা প্রমাণিত হয়েছে। বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যালয়গুলো হচ আলীকদম থানায়—আমতলী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মং প্রাইমারী বিদ্যালয়। থানচি থানায় নিয়াবুট ত্রো প্রাথ বিদ্যালয়, কানজিও পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাইধারী মিক বিদ্যালয় এবং লাইসিং প্রাথমিক বিদ্যালয়। রুমা থ কালাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, পানতলা হেডম্যান পাড়া মিক বিদ্যালয় এবং বতুরাম পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সেনাবাহিনীর এ্যাম্বুশ ও হয়রানি

বাঘাইছড়ি। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাঘাইছড়ি থানার উগলছড়ি মুখ ধীরেন্দ্র লাল কার্বারী পাড়ার ১৩ জন জুম্মকে অযথা জিজ্ঞাসাবাদ ও ঘর-বাড়ী তল্লাশীসহ বিভিন্ন হয়রাণীর শিকার হতে হয়েছে। ঘটনা বিবরণে জানা যায় যে, ৩রা সেপ্টেম্বরের দিবাগত রাত্রে কজোইছড়ি (শিক্ষক) ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন জিহাদ (৪৬ বেঙ্গল) ধীরেন্দ্র লাল কার্বারী পাড়ার শিক্ষক নদীর উত্তর কূলে ও চিন্তারামছড়া (শিক্ষক) ক্যাম্পের লেঃ হাজারী (৪৬ বেঙ্গল) দক্ষিণ কূলে শান্তিবাহিনীকে এ্যাম্বুশ করে সারা রাত্রি অবস্থান করে। পরদিন ক্যাপ্টেন জিহাদ উক্ত গ্রামের ঘর-বাড়ী তল্লাশী ও অযথা জিজ্ঞাসাবাদ করে নিরীহ জুম্মদের হয়রানী করে। নিগৃহীত জুম্মরা হচ্ছেন—১) সুভাষ চন্দ্র চাকমা (৫০), পিতা—মৃত জগৎ চন্দ্র চাকমা, ২) অবতার চাকমা (৩০), পিতা—মৃত কি চাকমা ৩) বুদ্ধ লাল চাকমা, (৫৬), পিতা—বুধু মনি চ ৪) নিল রঞ্জন চাকমা (৪৫), পিতা—মৃত শ্রীবংস ৫) মিলন কান্তি চাকমা (৬২), পিতা—মৃত অক্ষয় মনি ৬) অজিত কুমার চাকমা (২৮), পিতা—মৃত ধীরেন্দ্র লাল ৭) প্রীতিময় চাকমা, পিতা—ঐ, ৮) উদয়ন চাকমা, পিতা—কানাই লাল চাকমা, ৯) চিত্র মোহন চাকম পিতা—মৃত সমযমুনি চাকমা, ১০) প্রতুল চন্দ্র চাকমা পিতা—মৃত ধীরেন্দ্র লাল কার্বারী, ১১) সূর্যধন চাকমা পিতা—কর্ণমুনি চাকমা, ১২) ত্রিদিব চাকমা (২৮) সূর্যধন চাকমা এবং ১৩, বিন্দু চাকমা (৩৪), পিতা—ঐ

ছাত্র মিছিলে পুলিশের হামলা

খাগড়াছড়ি। ৩০শে অক্টোবর। গত দুই দিনে খাগড়াছড়ি জেলায় বাংলাদেশ পুলিশের হামলায় ৩০ জন জুম্ম ছাত্রছাত্রী আহত ও ২৩ জন ছাত্রকে আটক করা হয়েছে। ছাত্র পরিষদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ ও প্রসিত বিকাশ খীসার আটকের প্রতিবাদে আহূত বিক্ষোভ মিছিলের উপর এই বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ২৬শে অক্টোবরে ছাত্র পরিষদের সভাপতি প্রসিত বিকাশ খীসাকে আটক করে নানিয়াচরে এক ছাত্র সমাবেশকে বাংলাদেশ সেনারা বানচাল করে দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ২৮শে অক্টোবরে খাগড়াছড়িতে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এদিন শতাধিক পুলিশ এই বিক্ষোভ মিছিলের পেছনের দিকে আক্রমণ চালায়। এতে ২১ জন ছাত্রছাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে ছাত্রীদের বেশী জখম করা হয়। আহতরা হচ্ছে—সঞ্চিতা চাকমা পিতা লালন মাস্টার, ইলা চাকমা, চন্দ্রা চাকমা, মুক্তা চাকমা, পুলক চাকমা, দিপঙ্কর চাকমা, তগেশ চাকমা, প্রমুখ। এদিন আরও ১৫ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হচ্ছে —রূপক চাকমা, বোধিপ্রিয় চাকমা, জ্যোতি বিকাশ চাকমা প্রমুখ।

এছাড়া খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিলের উপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে ২১শে অক্টোবরে দিঘীনালাতে ছাত্র পরিষদ আরও এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এই মিছিলের উপর পুলিশ হামলা চালিয়ে ৮ জন ছাত্রছাত্রীকে জখম করে। এদের মধ্যে অনেকে ছাত্রী গুরুতর ভাবে আহত হয়। উল্লেখ্য যে, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিরোধের মুখে খাগড়াছড়িতে ২৭ জন, দিঘীনালায় ১৩ জন পুলিশও আহত হয়।

তোমার চিন্তা-চেতনা ও আত্মোৎসর্গ আমাদের কাছে এক অপার বিস্ময়। তোমারই রচিত পথ ধরে এগিয়ে যাবার শপথ নিয়েছি জুম্ম জাতির অস্তিত্ব তথা মানবতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে। তোমার আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যাবেনা।

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনা: তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।